মি'রাজ ও বিজ্ঞান

মূল
বাকিয়াতুস সালফ, হুজ্জাতুল খালফ
কুতবে দাওরান, মুজাদ্দিদে যামান
হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

তরজমা
মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

পরিবেশনায়

রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারি দাস রোড,
ঢাকা-১১০০, মোবা: ০১৯৩৪৯৩৩১১

اسم الكتاب

"تَنْوِيْرُ السِّرَاجِ فِىْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ" هٰذَا فَصْلٌ مِّنْ فُصُوْلِ نَشْرِ الطِّيْبِ فِىْ ذِكْرِ النَّبِيِّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مصنفه

بقية السلف حجة الخلف-مجدد الملة حكيم الامة امام ربانی حضرت مولانا شاه اشرف علی تهانوی (رح) قدس الله سره-

☆☆☆

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَبَدًا بِالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ
اٰمِيْنَ يَارَبَّنَا مَادَامَ نَازِلَةً-اِجَابَةً وَجَبَتْ لِدَعْوَةِ النَّدَمِ

☆☆☆

لِكُلِّ نَبِيٍّ فِى الْاَنَامِ فَضِيْلَةٌ-وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوْعَةٌ بِمُحَمَّدٍ
مَا اَنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَةٍ-وَلٰكِنْ مَّقَالَتِىْ مُدِحَتْ بِمُحَمَّدٍ

পেশ কালাম

সর্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহ তাআলার অগণিত শোকর আদায় করিতেছি, যিনি তাঁহার প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আপন কুদরাতের অগণিত নিদর্শন প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশে মহানতম মেহমান সাজাইয়া এক বিশেষ রজনীতে অদ্বিতীয় বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস তৎপর সেখান হইতে আসমানে ও উহার উপরে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ইমামুল আম্বিয়া বানাইয়া এবং নির্জনে রাখিয়া স্বীয় বাক্য বিনিময় করতঃ সম্মানের সর্বশেষ সীমায় এমনভাবে উন্নীত করিয়াছেন, যাহার মধ্যে দুনইয়া ও আখেরাতের অগণিত কল্যাণ এবং গণনাতীত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা, জাহেরী ও বাতেনী, স্পষ্টে ও গোপনে রাখিয়া দিয়াছেন। যিনি এই মি'রাজকে তাঁহার হাবীবের জন্য একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হিসাবে গণ্য করিয়া সকল আম্বিয়াগণের তামাম মু'জিযা উহার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন।

জ্ঞান–বিজ্ঞানের দ্বারা আদিকাল হইতে এই পর্যন্ত যত কিছু আবিষ্কার হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরো যত কিছু আবিষ্কার হইবে, আর বৈজ্ঞানিকগণের যত প্রকারের গর্ব ও অহংকার আছে, সেই প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ ঐ সবগুলিকে একত্রিত করিয়া এই মি'রাজের পেটে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। যেইভাবে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাপের পেটে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন জাদুকরদের তামাম জাদুকরী বস্তু, আর ফিরআউনের সকল প্রকারের গর্ব ও অহংকার।

অতএব বিজ্ঞান দ্বারা যত কিছুই আবিষ্কার হউক না কেন, উহার জন্য বহু বৎসর পূর্বে মি'রাজের মধ্যে হইয়া রহিয়াছে। তাই কাহারো অহংকার ও গর্ব করার মত এমন কিছু বাকী নাই।

ফয়েজ ও বরকত পাওয়ার আশায় এবং দোয়া লাভের উদ্দেশে তৎকালীন বৃটিশ ভারত উপমহাদেশের আলেমকুলের মহাসম্রাট, কুতবুল আলম, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত, হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী

থানভী (রহঃ) কর্তৃক লেখিত "তানভীরুস্ সিরাজ ফী লাইলাতিল মি'রাজ" যাহা তিনি তাঁহার রচিত 'নশরুত্তীব ফী যিকরিন নাবিইল হাবীব' কিতাবে মি'রাজ অধ্যায় হিসাবে পৃথকভাবে লেখিয়াছিলেন, আমি উহার টীকা সহকারে অনুবাদ করিয়া এবং উপটীকা নামে আরো কিছু ব্যাখ্যা নিজে লেখিয়া 'মি'রাজ ও বিজ্ঞান' নাম রাখিয়াছি। মূল কিতাবের টীকাকে টীকা হিসাবে এবং প্রথম চিহ্ন অর্থাৎ এই ( ) চিহ্নকে প্রথম চিহ্নরূপে ঠিক রাখিয়া যথাস্থানে লেখিয়া দিয়াছি। আর আমি নিজে যে টীকা লেখিয়াছি, উহার নাম উপটীকা রাখিয়াছি এবং আমার লেখার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ { } এই চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। ইহা দ্বারা সাধারণ পাঠকগণ সহজেই বুঝিয়া নিতে পারিবেন যে, কোন্ টীকা মূল কিতাবের এবং কোন্ অংশ অনুবাদকের কোন কোন স্থানে শাব্দিক অর্থে অনুবাদ না করিয়া ভাব অর্থে অনুবাদ করিয়াছি।

অনুবাদ একটি কঠিন কাজ, উপরন্তু ভাষা জ্ঞান না থাকিলে আরো কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অতএব আমার মত অযোগ্য লোকের জন্য বই লেখা ও অনুবাদ করা সর্বদিক দিয়া মহা কঠিন ব্যাপার। তাই আমার অনুবাদে ভুলত্রুটি থাকা অতি স্বাভাবিক। সেইহেতু যেকোন ভুলভ্রান্তি নজরে আসিবে; দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব। ইনশাআল্লাহ যত্ন সহকারে আগামী মুদ্রণে সংশোধনের চেষ্টা করিব।

হে করুণাময় আল্লাহ! অনুগ্রহ করিয়া এই বইখানাকে কবুল করুন। যাঁহারা আপনার হাবীবের গ্রন্থখানা পাঠ করিবেন কিংবা কান পাতিয়া শুনিবেন অথবা দান করার নিয়তে ক্রয় করিবেন, আপনি তাঁহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন। তাঁহাদের বালা-মুছিবত দূর করিয়া দিন। ঈমানদার মুসলমানরূপে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করার শক্তি দান করুন। আমাদের সকলকেই এই উসিলায় আখেরাতে নাজাত দানের উদ্দেশে ঈমানের সহিত মউত নছীব করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন।

— অনুবাদক

রজব– ১৪০০ হিজরী, জুন–১৯৯৯

কৃতজ্ঞতা

দয়াময় আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে অনেক মানুষকে প্রচুর পরিমাণ ধন-দৌলত প্রদান করিয়াছেন, বাড়ী-গাড়ীর মালিক বানাইয়াছেন এবং বহু টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করার তাওফীক দিয়াছেন।

তাঁহাদের মধ্যে এমন বহু লোক রহিয়াছেন যাঁহারা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামত প্রাপ্ত হইয়া শোকর করণার্থে সেই মহান আল্লাহ তাআলার পথে খোলা মনে বিনা দ্বিধায় ব্যয় করিতে থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, আল্লাহর দেওয়া মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ হইবে, সংকোচ আবার কিসের? বস্তুতঃ তাঁহারাই হইতেছেন প্রকৃত ছখী বা দাতা।

যুগে যুগে এইরূপ ঈমানদার দানশীলগণের আর্থিক সাহায্য দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শত্রুর কবল হইতে বাঁচাইয়াছেন এবং প্রকাশ ও প্রচার হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দুনইয়ার প্রায় সকল মসজিদ ও মাদ্রাসা এবং অগণিত ইসলামী বইপুস্তক তাঁহাদের দানের ফল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের দানে ইসলাম মহা শক্তিশালী হইয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। মক্কা মুয়াজ্জমায় সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াতী কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আরকাম ইবনে আরকামের বাড়ী পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন। ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার ইতিহাসে ইহাই প্রথম বাড়ী। এই আরকামের বাড়ীতেই ইসলামের আওয়াজ প্রথমে জন্ম হইয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িয়াছিল মদীনা তাইয়েবায় হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) তাঁহার বাড়ীর নীচের তলা হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দান করিয়াছিলেন। হুজুর এই বাড়ীতে থাকিয়া ইসলামের প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। এই আবু আইয়ুবের (রাঃ) দানকৃত যমীনে (যাহা তিনি দান করার জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন।) আজ পবিত্র মদীনার মাস্জিদে নববী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে দানশীলগণ দান না করিলে মসজিদ ও মাদ্রাসা ইত্যাদি কিছুই হইত না এবং ইসলামের প্রচার ও প্রকাশ বহুলাংশে ব্যাহত হইয়া যাইত।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় দ্বীনকে মু'আল্লেমীনগণের তালীম ও মুবাল্লেগীনদের তাবলীগ এবং মুজাহিদদের রক্ত, আর দানশীলদের দান ও লেখকদের লেখাসহ বিভিন্ন উসিলায় জিন্দা রাখিয়াছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

এখন আমার কথা বলিতেছি ঃ যাঁহারা আমার এই বইখানা ছাপার ব্যাপারে আর্থিকসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন, আমি আজ তাঁহাদের নাম স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না, আল্লাহ তাআলা যেন উভয় জাহানে তাঁহাদের মঙ্গল করেন, ইহাই দোআ করি।

তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে এই বইটি গত ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ ইংরেজীতে প্রথম মুদ্রিত হইয়া বাহির হওয়ার সাথে সাথে অল্প কিছু দিনের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। অতঃপর ১৯৮৯ ইংরেজিতে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়া হাতেগনা কয়েক মাসে শেষ হইয়া যায়। "মি'রাজ ও বিজ্ঞান" পড়ার জন্য জনগণের মধ্যে আরো হাজার হাজার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নানা অসুবিধার দরুন বইটি পুনঃ মুদ্রিত করিয়া এতদিন পর্যন্ত জনতার হাতে দিতে পারি নাই, সেই জন্য আমরা জাতির নিকট বড়ই লজ্জিত।

দয়াময় আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে তৃতীয় বার মুদ্রিত করিয়া বইটিকে বাজারে ছাড়িতে পারিয়া করুণাময়ের সমীপে অসংখ্য শোকর আদায় করিতেছি। আলহামদু লিল্লাহ। আশা করি আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহে এই বারও জাতি ইহাকে অতীব সম্মানের সহিত কোলে তুলিয়া আদর করিবেন।

বিঃ দ্রঃ– সকলের সুবিধার্থে হযরত থানভী (রহঃ)-এর মূল বইয়ের অনুবাদ বক্সের [ ] ভিতরে রাখিয়াছি। আর টীকা ও উপটীকা বক্সের বাহিরে খোলাভাবে লেখিয়াছি।

বইটি নির্ভুল করার উদ্দেশে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা

قَدْ كَانَ اَحْمَدُ سَيِّدَ الْاَكْوَانِ - بِعَجَائِبِ فَاقَتْ عَلَى التِّبْيَانِ

سُبْحَانَ مَنْ اَسْرَاهُ مِنْ اُمِّ الْقُرٰى - مَا فَوْقَ عَرْشٍ لَيْلَةً فِىْ اٰنِ

قَدْ شُقَّ صَدْرُهٗ ثُمَّ اُفْعِمَ قَلْبُهٗ - حُكْمًا لِحَمْلِ عَجَائِبِ الْفُرْقَانِ

مَلَكٌ اَتٰى بِبُرَاقِهٖ لِلرَّكْبِ فِىْ - حَرَمٍ نَوْمُهٗ كَانَ بِالْيَقْظَانِ

لَمَّا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ قَدْ - طَارَ الْبُرَاقُ كَسُرْعَةِ اللُّمْعَانِ

فَسَعٰى وَكَانَتْ مَوْضَعُ الْقَدَمَيْنِ فِىْ - مَا تَنْتَهِىْ مِنْهُ بِهِ الْعَيْنَانِ

فَلَقَدْ اَتٰى فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ - مَا قَطُّ قَدْ وَقَعَتْ بِهِ الْقَدَمَانِ

فَالْاَنْبِيَاءُ لَهٗ هُنَاكَ اسْتَقْبَلُوْا - بِصَلٰوتِهٖ صَلُّوْا مَعَ الشُّكْرَانِ

لَمَّا اِسْتَقَرَّ لَدَى السَّمَاءِ وَبَابِهَا - قَرَعَ الرَّفِيْقُ الْبَابَ بِاسْتِيْذَانِ

قَدْ قِيْلَ مَنْ ؟ فَاَجَابَ جِبْرِيْلُ انَا - بِمُحَمَّدٍ نُدْعٰى مِنَ الرَّحْمَانِ

فَصَلَوتُنَا مُتَوَاتِرًا وَسَلَامُنَا - اَبَدًا عَلَيْهِ وَسِيْلَةَ لِاَمَانِىْ

আহমাদুল আরবের সৌজন্যে।

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً اِلٰى حَرَمٍ - كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِىْ دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ

وَبِتَّ تَرْقٰى اِلٰى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً - مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا - وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَى الْخَدَمِ

وَاَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ - فِىْ مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

فَخَرْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ - وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا - مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

لَمَّا دَعَا اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ - بِاَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْاُمَمِ

কাসীদা বুরদার সৌজন্যে

শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

২৭, কোর্ট হাউজ স্ট্রীট

ঢাকা-১১০০

১৯৮০ ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মি'রাজ ও বিজ্ঞান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

–সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়াত নিদর্শনের কামালাতপূর্ণ আজিমুশশান ঘটনাসমূহের মধ্য হইতে মি'রাজ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা {মু'জিযা}। এই মি'রাজ জোহরীর মতানুসারে নবুয়াতের পর ৫ম হিজরীতে হইয়াছিল (ইমাম নাবুবীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন)।

সাহাবীগণের মধ্য হইতে যাঁহারা মি'রাজ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ২৬ জন, তার মধ্যে পুরুষ ২১ জন ও মহিলা ৫ জন। ১। হযরত ওমর (রাঃ) ২। হযরত আলী (রাঃ) ৩। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৫। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ৬। হযরত ইবনে আমর (রাঃ) ৭। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ৯। হযরত আনাস (রাঃ) ১০। হযরত জাবির (রাঃ) ১১। হযরত বুরাইদা (রাঃ) ১২। হযরত সমরা বিন জুনদাব (রাঃ) ১৩। হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) ১৪। হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) ১৫। হযরত ছুহাইব (রাঃ) ১৬। হযরত মালেক বিন ছ'ছু (রাঃ) ১৭। হযরত আবি

উমামা (রাঃ) ১৮। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) ১৯। হযরত আবু হাব্বা (রাঃ) ২০। হযরত আবু যার (রাঃ) ২১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ২২। হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব (রাঃ) প্রমুখ পুরুষ বর্ণনাকারী ছিলেন। ২৩। এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) ২৪। হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) ২৫। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) ২৬। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) মহিলা বর্ণনাকারিনীগণ হিসাবে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। উপরোল্লিখিত বর্ণনাকারীগণ ব্যতীত মি'রাজ হাদীস বর্ণনাকারী আরও রহিয়াছেন। কোন কোন ঘটনার বর্ণনা আমি তাঁহাদের নিকট হইতে লিখিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যেখান হইতে মি'রাজ আরম্ভ

১। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ আমি হাতীমের মধ্যে শায়িত ছিলাম। –বুখারী

২। আর একটি হাদীসে রহিয়াছে, "তিনি শিয়াবে আবি-তালিবে ছিলেন।" –ওয়াকিদী

৩। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, প্রিয় নবী উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। –তিবরানী

৪। আরো একটি হাদীসে পাওয়া যায়, হুজুর নিজ গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার গৃহের ছাদ ফাঁক হইয়া গিয়াছিল। –বুখারী

ব্যাখ্যা –{ক} উপরোল্লিখিত হাদীসগুলির সামঞ্জস্য এইরূপে হইবে যে, উম্মে হানীর ঘর 'শিয়াবে আবি তালিবের' নিকটে ছিল। হুজুর (সঃ) সেই ঘরে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন, নিজের বিশ্রামাগার হিসাবে উহাকেই আপন ঘর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেখান হইতে তাঁহাকে হাতীমে আনা হইয়াছিল, ঘুমের ঝুঁকি তখনও যায় নাই, তাই হাতীমে আসিয়া আবার একটু শুইয়া পড়িলেন। {১}

উপটীকা–{১} বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, মি'রাজ কয়েক বার হইয়াছিল। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, এক বার হাতীম হইতে আবার 'শিয়াবে আবি তালিব' হইতে, আর একবার উম্মে হানীর গৃহ হইতে, অনুরূপভাবেই কোন এক সময় নিজ গৃহ হইতে মি'রাজ হইয়াছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

[উপটীকা শেষ]

{খ} ঘরের ছাদ ফাঁক হওয়ার মধ্যে এই হিকমাত-দর্শন রহিয়াছে যে, এই রজনীতে তাঁহার মাধ্যমে সর্বসাধারণের ক্ষমতার বহির্ভূত যে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইবে, তাহা যেন তিনি ছাদের ফাঁক দেখিয়া প্রথম হইতেই উপলব্ধি করিতে পারেন। {১}

উপটীকা ঃ {১} কুরআনে আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

–নিশ্চয় যাহারা হুজরার বাহির হইতে আপনাকে ডাকে, তাহাদের অনেকের জ্ঞান নাই। – হুজুরাত, রুকু-১, আয়াত-৪

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ

–হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিও না। – পারা-২২, আহজাব, রুকু-৭, আয়াত ৫৩

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল, প্রিয়তম নবীকে বাহির হইতে আহ্বান করা যাইবে না এবং বিনা অনুমতিতে তাঁহার ঘরে আসাও যাইবে না। ফেরেশতাগণ মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। এই দিকে হুজুর ঘরের ভিতর নিদ্রিত রহিয়াছেন, তাই বাহির হইতে ডাকা যাইতেছে না এবং ঘরের ভিতর আসাও যাইতেছে না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে দুই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। {ক} যেই ঘরের ছাদ নাই উহা ঘর হিসাবে গণ্য নহে, অতএব সেখানে যাইতে অনুমতি লাগিবে না। {খ} দ্বিতীয়তঃ দরজা দিয়া আসিলে অনুমতির প্রয়োজন, কিন্তু উপর হইতে ছাদের পথে নীচের দিকে আসার জন্য মনে হয় অনুমতির প্রয়োজন নাই। বোধহয় অনুমতি হইতে বাঁচার জন্য ছাদ ফাঁক করিয়া এই বিকল্প ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

[উপটীকা শেষ]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাশরীফ নেওয়ার বর্ণনা

{ক} কিছুটা নিদ্রাবস্থায় আর কিছুটা জাগ্রতাবস্থায় ছিলেন।

{খ} অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময় জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়াছিলেন।

{গ} আর এক সূত্রে বর্ণিত, তিন জন {ফেরেশ্তা} আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের তিন জনের মধ্য হইতে একজন বলিলেন (উপস্থিত লোকদের মধ্যে) তিনি (অর্থাৎ পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কোন্ ব্যক্তি? দ্বিতীয় জন উত্তর দিলেন, যিনি সকলের উত্তম জন। অবশেষে তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, তাহা হইলে যিনি সকল হইতে উত্তম ও সম্মানিত, তাঁহাকেই লও। দ্বিতীয় রাত্রে সেই তিন জনই তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং কিছু না বলিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। – বুখারী

ব্যাখ্যা–{ক} "তিনি কিছুটা নিদ্রায় ও কিছুটা জাগ্রতাবস্থায় ছিলেন," উহার অর্থ ঘটনার একেবারে প্রথম দিকে {যেই সময় ফেরেশ্তা আসিয়াছিলেন সেই সময়} তিনি কিছুটা নিদ্রায় ছিলেন, অতঃপর জাগ্রত হইলেন এবং ঘটনার শেষ পর্যন্ত জাগ্রতাবস্থায় ছিলেন।

অন্য বর্ণনায় মি'রাজ হাদীসের শেষের দিকে আসিয়া জাগ্রত হওয়ার যে কথাটি রহিয়াছে–"অবশেষে আমি সজাগ হইলাম", উহার অর্থ, উক্ত অবস্থা হইতে চৈতন্য লাভ করিলাম এবং অজানা বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলাম। কোন কোন মুহাদ্দিস উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত অংশ 'অবশেষে আমি সজাগ হইলাম'কে হাদীসের রক্ষিত অংশ নহে বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। {খ} উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে তিনি কে? ইহা বলার

কারণ এই হইতেছে যে, কোরাইশগণ কাবা শরীফের আশপাশে নিদ্রা যাইত। – তিবরানী

দ্বিতীয়তঃ তিবরানীর মধ্যে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, প্রথমে জিব্‌রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) আসিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে কিছু বাক্যালাপ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিন জন আসিলেন।

হুজুর পাক হইতে বর্ণিত মুসলিম শরীফের এক হাদীস দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, আমি ধ্বনি উচ্চারণকারী এক ব্যক্তিকে এই বলিতে শুনিয়াছি– এই তিন জনের মধ্যে ঐ ব্যক্তি যিনি মাঝখানে শুইয়া রহিয়াছেন।

মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে ব্যক্ত হইয়াছে- ঐ দুই ব্যক্তি হযরত হামযা ও হযরত জাফর (রাঃ) ছিলেন। হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাদের উভয়ের মাঝখানে থাকিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বক্ষ বিদীর্ণ

হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার পেটের ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নদেশ পর্যন্ত ফাঁড়া হইয়াছিল এবং তাঁহার কলব বাহির করিয়া স্বর্ণ তশ্‌তরীতে সুরক্ষিত জমজম শরীফের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছিল। – আবু যার ঃ মুসলিম

আরেকটি সূত্রে বর্ণিত, উক্ত তশ্‌তরীতে ঈমান ও জ্ঞান ভর্তি ছিল। সেই ঈমান ও জ্ঞান দ্বারা কলবকে পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল। অতঃপর কলবকে তাহার নিজ স্থানে রাখিয়া জখম ভাল করিয়া দিয়াছিল। {১}

–(মালিক বিন ছু'ছু' ঃ মুসলিম)

ব্যাখ্যা–{ক} ফেরেশতাগণ তাঁহার কলব জমজম শরীফের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন, অথচ হাউজে কাউসারের পানি আনিলেন না কেন? ইহার উত্তরে বিদ্বানগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন, হাউজে কাউসার হইতেও জমজমের পানি উত্তম। –শাইখুল ইসলাম বালকীনী

{খ} স্বর্ণ নির্মিত তশ্‌তরী ব্যবহার করা হারাম, তবুও কেন এখানে ব্যবহৃত হইল? উহার জওয়াব কয়েক ধরনে দেওয়া যায়।

১ম জওয়াব ঃ স্বর্ণ ব্যবহার তখন হারাম ছিল না, মদীনায় যাওয়ার পর হারাম হইয়াছিল। –(ফতহুল বারী)

উপটীকা ঃ {১} اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

–আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিই নাই?

– পারা–৩০, সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত–১

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

প্রকাশ থাকে যে, বিখ্যাত বর্ণনা মতে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ তিন বার হইয়াছিল। প্রথম বার ৪র্থ বৎসর বয়সে ধাত্রীমাতা হালীমার (রাঃ) গৃহে। দ্বিতীয় বার হেরা পর্বতের গুহায় কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং তৃতীয় বার এই মি'রাজ রজনীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্য আর এক সূত্রে বর্ণিত, তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ চারি বার হইয়াছিল।

এই সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণের মধ্যে বহু হিকমাত রহিয়াছে। যাহার মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটি হিকমাত লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যেমন– প্রথম বার বক্ষ বিদীর্ণের মধ্যে মানবীয় বালকসুলভ অবস্থা ও ছেলেমী ভাব দূরীভূত করা মাকছুদ ছিল। দ্বিতীয় বারে তাঁহাকে কুরআন ধারণ করার উপযোগী করা হইয়াছিল। মহাগ্রন্থ কুরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ আমানাত। এই মহা পবিত্র আমানাত রাখিবার জন্য সর্বোত্তম পাত্রের প্রয়োজন, সেইজন্য সিনা চাক করিয়া হুজুরের অন্তরকে কুরআন রাখার মহা পবিত্র ভান্ডাররূপে গণ্য করা হইল।

অনুরূপভাবে মি'রাজ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণের মধ্যেও অনেক হিকমাত থাকিবে। যিনি মায়ের পেট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে বসবাস করিতেছেন, বিশ্বজগতের আবহাওয়ার সহিত মিলিয়া মিশিয়া ৫২ বৎসর পর্যন্ত জীবন যাপন করিয়াছেন, সেই একই মানুষ তিনি আজ এই পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যান্য অনেক জগত ভ্রমণে চলিয়া যাইবেন, প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাস, তারপর মহাশূন্যে, এরপর আসমানে; অতঃপর সিদরাতুল মুন্তাহা যাইয়া উপস্থিত হইবেন। আবার বেহেশ্ত ও দোযখ পরিদর্শন করিবেন, তিনি আরশ ও কুরসীসহ আজ অনেক কিছু অবলোকন করিবেন, নূরের জগত পার হইয়া এক বিশেষ স্থানে যাইয়া পৌঁছিবেন। এমনকি আলমে বারযাখের

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

২য় জওয়াব ঃ মি'রাজের ঘটনাসমূহ আখেরাতের ঘটনার সমতুল্য। আর আখেরাতে স্বর্ণ ব্যবহার বৈধ।

৩য় জওয়াব ঃ হুজুর নিজে স্বর্ণ ব্যবহার করেন নাই। ফেরেশতাগণের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার অবৈধ নহে। –ইবনে আবি হামযা।

{গ} তশ্‌তরীর মধ্যে ঈমান ও জ্ঞান থাকার ব্যাখ্যা এই যে, তশ্‌তরীতে আল্লাহর কুদরতের গায়েবী এমন ধাতু ছিল, যাহাতে ঈমান ও জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। যেইরূপভাবে পৃথিবীতে কোন কোন ধাতু–পাথর এমন রহিয়াছে, যেইগুলি ব্যবহার করিলে অন্তর ও মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ে এবং আরাম পাওয়া যায়। {মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার উপকার লাভ করা যায়।} ঈমানের স্থান অন্তরে আর জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে। ঈমান ও জ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্তর ও মস্তিষ্কের অস্তিত্বের উপর। এই কারণেই অন্তর ও মস্তিষ্কের নাম না বলিয়া ঈমান ও জ্ঞানের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। (এইরূপেই ইমাম নাবুবী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।)

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

বিষয়সমূহ দেখিবার পর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে দুই চোখে অবলোকন করিবেন। আসলে তিনি আল্লাহকে দেখিয়াছেন কিনা; তাহা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আজ এই সকল কুদরাত দেখিবার ও বুঝিবার জন্য তিনি রওনা দিতেছেন। অতএব অদ্যকার বক্ষ বিদীর্ণ দ্বারা তাঁহাকে সেই সকল জগতে সুস্থ শরীরে চলাফেরা করার উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। এই বক্ষ বিদীর্ণ করার কারণে কোথাও তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় নাই, মস্তিষ্কে ব্যাঘাত ঘটে নাই এবং কর্ণ বন্ধ হয় নাই, চক্ষু টলে নাই। এক কথায় তাঁহার দেহ ও মন-মগজ সবই ঠিক ছিল।

আজকাল বিজ্ঞানীগণও এই নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও মহাশূন্যে পাঠাইতে হইলে তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিকে মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী করার জন্য ইনজেকশন দিয়া থাকেন ও বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা করেন। এমনকি তাঁহারা মহাশূন্যচারীকে পৃথক ধরনের পোশাক পরাইয়া এবং কিছু যন্ত্র শরীরের সহিত লাগাইয়া আরো অনেক ব্যবস্থার পর মহাশূন্যে পাঠাইয়া থাকেন। [উপটীকা শেষ]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বোরাক

অতঃপর প্রিয়তম নূর নবীর নিকট বোরাক নামে সাদা রংয়ের একটি জন্তু উপস্থিত করা হইল। যাহা গর্দভ হইতে কিঞ্চিৎ উঁচু এবং খচ্চর হইতে কিছু নীচু ছিল। উহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় এইরূপ ছিল যে, উহার এক একটি পা তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে ফেলিত। —মুসলিম

তাহার উপর গদি ও মুখে লাগাম লাগান ছিল। যখন হুজুর উহার পিঠে আরোহণ করিতে চাহিলেন তখন সে উদ্ধত হইয়া গেল এবং নড়াচড়া করিতে লাগিল। ইহা অবলোকন করিয়া হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম উহাকে বলিলেন, হে বোরাক! তোমার কি হইয়াছে, এমনভাবে যথেচ্ছা বিহার করিতেছ কেন? ইনি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। তিনি ব্যতীত এত বড় মহা সম্মানিত আর কোন মানুষ তোমার পিঠে আরোহণ করেন নাই। ইহা শুনামাত্র বোরাক ধীরস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং তাহার সমস্ত শরীর হইতে ঘাম বহিতে লাগিল। —তিরমিযী

অবশেষে হুজুর উহার উপর আরোহণ করিলেন, জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম তাহার রিকাব {অর্থাৎ গদিতে বসিয়া দুই পাশে পা রাখার বেড়ি} ধরিয়া এবং মিকাঈল আলাইহিস্ সালাম লাগাম ধরিয়া রাখিলেন।

{শরফুল মোস্তফা বুরদাইয়া – আবু সা'দ}

ব্যাখ্যা— অসন্তুষ্টির কারণে কিংবা রাগান্বিত হইয়া বোরাক উদ্ধত হয় নাই, বরং সে মহানন্দে পড়িয়া প্রফুল্ল চিত্তে এইরূপ নড়াচড়া করিতে লাগিল। অতঃপর যখন সে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক হুশিয়ারী বাক্য দ্বারা নূতনভাবে হুজুরের সম্মান ও মর্যাদার মহা উচ্চতা উপলব্ধি করিল, তখনি লজ্জিত হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গেল।

যেমন– একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক পাহাড়ের উপর তাশরীফ্ নিয়াছিলেন। তখন সেই পাহাড় আন্দোলিত হইতেছিল। হুজুর পাহাড়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– اِثْبتْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ "থাম! তোমার উপর আল্লাহর নবী, ছিদ্দীক ও দুই শহীদ আরোহণ করিয়াছেন," অমনি পাহাড় থামিয়া গেল। উপরোক্ত বোরাকের নড়াচড়ার ঘটনাটিও এই পাহাড়ের ঘটনার অনুরূপ। {১}

অন্য হাদীসে এ কথাটি পাওয়া যাইতেছে যে, জিবরাঈল আমার হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর আসমানে আসিয়া পৌঁছিলেন। – বুখারী

আরো একটি হাদীসে রহিয়াছে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) স্বয়ং বোরাকের উপর বসিলেন এবং তাঁহার পিছনে নবী করীম (সঃ)-কে বসাইয়া ছিলেন। (ইবনে হাব্বান তাঁহার ছহীতে এবং হারিছ তাঁহার মুসনাদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।)

সুতরাং এই হাদীস দুইটির সহিত উপরোল্লিখিত হাদীসের মতবিরোধ ঘটে নাই। কেননা হয়ত হযরত জিবরাঈল প্রথমে বোরাকে এই উদ্দেশে

উপটীকা ঃ{১} তিরমিযী শরীফের হাদীস এবং মূল গ্রন্থকার হযরত থানভী {রাহঃ}-এর তরজমা ও ব্যাখ্যা দ্বারা এই অধমের খেয়ালে বোরাক সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছে।

{ক} **ক্রোধ ঃ** অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত না হইয়া বোরাক এইরূপ যথেচ্ছা বিহার করিল কেন? যদি সে ক্রুদ্ধই না হইয়া থাকে তবে নড়াচড়া করিবে কেন? বেআদবী বা করিবে কেন?

{খ} **আনন্দ ঃ** খুশী ও আনন্দে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কেহ কি কাহারো সহিত অপ্রত্যাশিত ব্যবহার করে? আনন্দিত ও প্রফুল্ল হওয়ার সহিত কখনো কি কষ্টদায়ক প্রবণতা মিশ্রিত হইতে পারে?

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

{গ} **হুশিয়ারী বাণী ঃ** আশেক তাহার মাশুকের সহিত, বন্ধু তাহার বান্ধবের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহাও কি কাহারো বলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা রাখে? বোরাক্ ত হুজুর আকদাসের আশেক-ই ছিল, হুশিয়ারী বাণীর প্রয়োজন সেখানে কোথায়? তবে এখানে উহার ব্যতিক্রম কেন?

{ঘ} **পুনরায় নূতন ঃ** পুনরায় নূতনভাবে হুজুরের ইজ্জত সম্মান এবং গৌরব ও মহত্ত্বের কথা জানাইয়া দেওয়ার অর্থ কি? এখানে "নূতন" শব্দ ব্যবহার কেন হইল?

ক, খ, গ ও ঘ-এর জওয়াব একই সঙ্গে দেওয়া হইতেছে যে, বোরাক পূর্ব হইতেই হুজুরের ইজ্জত সম্মান সম্বন্ধে খুব ভালভাবে জ্ঞাত ছিল। আর পূর্ব হইতেই সম্মানের কথা জানা ছিল বলিয়াই আজিকার এই সময়ে হযরত জিবরাঈল কর্তৃক সেই সম্মানের ঘোষণা করাকে হযরত থানভী {রাহঃ} তাঁহার ব্যাখ্যায় "পুনরায় নূতনভাবে ঘোষণা" হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেন পুরাতন জানা কথাকে আবার নূতনভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। ইহাই হইতেছে পুনরায় নূতনভাবে জানাইয়া দেওয়ার অর্থ। বস্তুতঃ বোরাকের পূর্ব হইতে জানা ছিল বলিয়াই এখন শুনামাত্র লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং সর্বশরীরে ঘামের স্রোত বহিয়া চলিল।

উল্লিখিত একই কারণে অদ্য বোরাক সেই পূর্বালোচিত মহাসম্মানের অধিকারী প্রিয়তম নূর নবী সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাহার সামনে দেখিতে পাইয়া খুশী ও আনন্দে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিল। যিনি এত বড় সম্মানিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, যাঁহার সমকক্ষ আর কোন নবী নাই, যাঁহার বদৌলতে আসমান ও যমীন সৃষ্টি, তিনি আজ আমার পিঠে তাশরীফ রাখিবেন, তাঁহার পদধুলায় অদ্য আমি ধন্য হইব, ইত্যাদি অনেক কথা ভাবিতে যাইয়া বোরাক দিশাহারা হইয়া পড়িল।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

তাহার আনন্দ চরমে উঠিয়াছিল। স্ফূর্তি অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, তাই সে মহানন্দে জ্ঞানহারা ও আত্মহারা হইয়া নাচিতেছিল। ইহাকেই শওখী বা যথেচ্ছা বিহার বলা হইয়াছে। কিরূপ থাকিলে বা কিরূপ ব্যবহার করিলে এই মুহূর্তে হুজুরকে সম্মান প্রদর্শন করা হইবে, ইহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। আর জি· ব্রাঈল (আঃ)-এর হুশিয়ারীর সাথে সাথে তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং বুঝিতে পারিল, ইহা তাহার মহা অন্যায় ও জঘন্য অপরাধ হইয়াছে। তাই লজ্জায় তাহার মাথা নত হইয়া গেল এবং এই মারাত্মক পরিস্থিতির কারণে তাহার সর্বশরীরে ঘাম বহিতে লাগিল।

(ঙ) **লজ্জা ঃ** হযরত জিবরাঈলের হুশিয়ারী বাক্যের মাধ্যমে নূতন করিয়া হুজুরের মহত্ত্ব ও গৌরবের কথা জানিতে পারিয়া বোরাক লজ্জিত হইল কেন? যেখানে ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছা বিহার রহিয়াছে, সেখানে কি আবার লজ্জা স্থান পাইতে পারে?

জিবরাঈলের কথার দ্বারা সে তো বড় জোর শুধু থামিয়া যাইবে এবং অপ্রত্যাশিত প্রবণতা বন্ধ করিয়া দিবে, ইহার বেশী নহে। তবে লজ্জা পাওয়ার কারণ কি?

(চ) **ঘাম ঃ** তাহার সর্বশরীর হইতে অত্যধিক পরিমাণে ঘামের স্রোত বহিতেছিল কেন? লজ্জা পাইল আবার ঘামও বাহির হইল। একই সঙ্গে দুই অবস্থা; তাহা হইলে আসল ব্যাপার কি ছিল?

ঙ ও চ-এর অধিকাংশ জওয়াব ক, খ, গ ও ঘ-এর জওয়াব দ্বারাই হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ হুজুরের সম্মানের কথা পূর্ব হইতে বোরাকের জানা ছিল, সেই জন্য হুশিয়ারী বাক্যের দ্বারা নিজের ভুল বুঝার সাথে সাথে লজ্জা আসিয়া তাহার অন্তরকে এবং ঘাম বাহির হইয়া তাহার দেহকে ঘিরিয়া ফেলিল। মন ও দেহ দুইটাই আজ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। যদি আগে জানা না থাকিত তবে লজ্জা পাইত না এবং ঘামও বাহির হইত না। লজ্জা ও ঘাম পূর্বে জানার নিদর্শন।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

মন, মগজ ও দেহ এই তিনটি নাম করা বড় অস্তিত্বের সমন্বয়ে প্রাণী।

০ বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতির স্থান মগজে।

০ লজ্জা, আনন্দ, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি থাকে অন্তরে।

০ ঘাম, রক্ত, মাংস ও হাড় প্রভৃতি থাকে দেহে।

অপর দিকে লজ্জা বাতেনী, দেখা যায় না এবং ঘাম জাহেরী, দেখা যায়। প্রিয়তম নূরনবীর সাথে বিবেকের ভুলে দিশাহারা হইয়া যথেচ্ছা বিহার করার কারণে বোরাকের মন ও মগজ এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর তথা জাহেরী ও বাতেনী এবং বাহিরে ও ভিতরে সব কিছুর মধ্যেই হুজুর আকদাসকে সম্মান করার অনুভূতি জারি হইয়া গিয়াছিল। সুবহানাল্লাহ। ইহাও হুজুরের একটি মু'জিযা।

বোরাক নড়াচড়া করার আর একটি বিশেষ কারণ

অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্তের মধ্যে বোরাকের পিঠে আরোহণ করার উদ্দেশে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লওয়ার জন্য বোরাক এইরূপ যথেচ্ছা বিহার করিয়াছিল। হুজুর যখন বেহেশতে তাহার পিঠে সাওয়ার হওয়ার ওয়াদা দিলেন তখনি বোরাক থামিয়া গেল।

বোরাক পরিচিতি ঃ বোরাক গর্দভ হইতে বড়, খচ্চর হইতে কিছুটা ছোট এবং মুখ মানব আকৃতির ছিল। অথচ ঘোড়ার আকৃতির মত কেন ছিল না? উহাতে হিকমাত রহিয়াছে যে, উক্ত বোরাকে চড়ার মধ্যে ইঙ্গিত হইল, ইহা যুদ্ধের জানোয়ার নহে। অতএব, ইহাতে কোন ভয়ভীতির কারণ নাই এবং পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই এবং উক্ত আশ্চর্য জানোয়ার দ্বারা হুজুরকে সর্বসাধারণের নিয়মের বহির্ভূত অলৌকিকভাবে ভ্রমণ করাইয়া মহান মুজিযা স্থাপন করাই উদ্দেশ্য ছিল।

– মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩; আত্তারিখুল কাভীম- লি মাক্কাতিন অ-বাইতিল্লাহিল কারীম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৯।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

মি'রাজ রজনীতে উম্মাতের কথা স্মরণ ঃ আরেকটি বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ বোরাকে চড়িয়া রওনা দেওয়ার পূর্বে প্রিয়তম নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাঁদিতেছিলেন। সেই সময় জিবরাঈল (আঃ) হুজুরকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আজ খুশী ও আনন্দের রাত্র, অথচ আপনার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ কি?

উত্তরে হুজুর ফরমাইলেন, আমি বড় আনন্দের সহিত বোরাকে চড়িয়া আসমানের দিকে যাইতেছি। কিন্তু আমার উম্মাতের উপায় কি? তাহারা গুনাহ্গার, হাশরের ময়দানে তাহাদের পার হওয়ার ব্যবস্থা কিভাবে হইবে?

জিবরাঈল বলিলেন, হুজুর! আপনি চিন্তিত হইবেন না, আপনার উম্মাতের গুনাহ্ আল্লাহ তাআলা মাফ করিয়া দিবেন এবং মেহমান বানাইয়া সম্মানের সহিত পার করাইয়া নিবেন।

প্রিয় পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, হুজুর মি'রাজ রাত্রিতে মহা আনন্দের সময়ও আমাদিগকে ভুলিয়া যান নাই। (সুবহানাল্লাহ্)

আরোহণ করিয়াছিলেন– যাহাতে নবী করীমের মানবীয় চিন্তা ও ভয়ভীতি না আসে। {১}। পরে তিনি নামিয়া রিকাব ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। আর উভয় অবস্থায় অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহণকারী হউক আর নীচেই হউক, প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে হুজুরের হাত মোবারক ধরিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ও ঠিক করিয়া দিতেন {২}।

উপটীকা ঃ {১} হুজুর অদ্যকার পূর্বে বোরাকে আর কোন দিন আরোহণ করেন নাই। সেইজন্য আরোহণ করার পদ্ধতি ও উপরে বসিবার নিয়ম হুজুরের জানা ছিল না। তাই জিবরাঈল প্রথমে নিজে আরোহণ করতঃ বোরাকে বসিয়া হুজুরকে দেখাইয়া দিলেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

{২} অর্থাৎ বোরাকে উঠিবার সময় জিবরাঈল (আঃ) হুজুরের হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিতেন, আবার নামিবার সময় হাত ধরিয়া নামাইয়া আনিতেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভ্রমণ পথে নামায

যখন তিনি গন্তব্যস্থানের দিকে রওনা দিলেন, সেই সময় তাঁহার রাস্তার মধ্যে এমন একটি যমীন পড়িল, যেখানে খেজুর বৃক্ষ অধিক পরিমাণে ছিল। জিবরাঈল হুজুরকে বলিলেন, আপনি এইখানে নামিয়া নামায পড়ুন। হুজুর নামায (নফল) সমাপ্ত করার পর পুনরায় জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনি 'ইয়াছরিবে' (১) (মদীনায়) এই নামায পড়িয়াছেন।

অতঃপর এক সাদা ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জিবরাঈল হুজুরকে সাওয়ারী হইতে নামিয়া নামায পড়িতে অনুরোধ জানাইলেন, আর আরজ করিলেন, আপনি মাদায়েনে আসিয়াছেন, হুজুর এখানে নামায পড়িলেন।

অবশেষে "বাইতুল লাহাম" যাইয়া পৌঁছিলেন। সেখানেও পূর্বের ন্যায় নামায পড়াইলেন। হুজুরের নামাযান্তে জিবরাঈল বলিলেন, ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান। –বাজ্জার, তিবরানী। বাইহাকী তাঁহার দালায়েলের মধ্যে এই হাদীসটিকে ছহীহ্ বলিয়াছেন।

অন্য হাদীসে মাদায়েনের পরিবর্তে 'তুরে সীনা'র নাম উল্লেখ রহিয়াছে। যেখানে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার সহিত কথা বলিয়াছেন। – নাসায়ী

টীকা ঃ (১) তখন ইহার নাম 'ইয়াছরিব' ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেখানে তাশরীফ নেওয়ার পর হইতে উহার নাম মদীনা হইয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে, এখন মদীনাকে ইয়াছরিব বলা মাকরূহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আলমে বারযাখ

এই অংশে এমন ধরনের আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইবে, যেইগুলির সহিত আলমে বারযাখের {কবরের} সম্পর্ক রহিয়াছে।

{১ নং হাদীস, প্রথম অংশ ঃ দুনইয়া ও শয়তানের সহিত সাক্ষাৎ}

নবী করীম (সাঃ) এমন এক বৃদ্ধার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যে বৃদ্ধা রাস্তার মাথায় দাঁড়ান ছিল। হুজুর জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বৃদ্ধা কে? জিবরাঈল বলিলেন চলুন, চলুন! হুজুর চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর এমন এক বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল, যে বৃদ্ধটি রাস্তা হইতে দূরে থাকিয়া হে মুহাম্মাদ (সঃ) এই দিকে আসুন বলিয়া হুজুরকে ডাকিতেছিল। জিবরাঈল বলিলেন, চলুন, চলুন।

{১ নং হাদীস, দ্বিতীয় অংশ ঃ নবীগণের সহিত সাক্ষাৎ ঃ}

অতঃপর যাইতে যাইতে একদল লোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালু, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আখিরু, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাশিরু –এই শব্দগুলি দ্বারা হুজুরকে সালাম দিলেন। জিবরাঈল আরজ করিলেন, তাঁহাদের সালামের উত্তর দিন। এই হাদীসের শেষের অংশে রহিয়াছে, জিবরাঈল বলিলেন, আপনি {কিছুক্ষণ পূর্বে} যে বৃদ্ধা রমণীকে দেখিয়াছিলেন সে ছিল দুনইয়া। আর এই দুনইয়া এখন এমন পরিণত বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা বৃদ্ধা মহিলাটির ঘটিয়াছে। {১}

উপটীকা ঃ {১} অর্থাৎ এই মহিলাটি একদিন খুব রূপসী, সুন্দরী যুবতী ছিল। তাহার রূপলাবণ্যে কত লোক যে ধোকায় পড়িয়াছে, মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী প্রেমের পাগল সাজিয়া অন্য সব কিছু হারাইয়া দিয়াছে, তাহার হিসাব কে

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ইহার পর যে বৃদ্ধ লোকটি আপনাকে ডাকিতেছিল, সে হইতেছে ইবলীস শয়তান। আপনি যদি ইবলীস ও দুনইয়ার ডাকে সাড়া দিতেন এবং তাহাদের আহ্বানের জওয়াব দান করিতেন, তাহা হইলে আপনার উম্মাতগণ আখেরাতের পরিবর্তে দুনইয়াকে প্রাধান্য দিত। দুনইয়াদার হইয়া যাইত। তাহার পর যাঁহারা আপনাকে সালাম দিয়াছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন পয়গাম্বর হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)। (বাইহাকী দালায়েলের মধ্যে এবং হাফেজ ইমাদুদ্দীন বিন কাছীর, আলফাজে নাকারা গারাবার মধ্যে এই হাদীসটিকে বর্ণনা করিয়াছেন।)

{২ নং হাদীস, প্রথম অংশ ঃ মুজাহিদদের অবস্থা}

তিবরানী ও বাজ্জারের হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হুজুর এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহারা একই দিনে বীজ বুনিত এবং {ফসল} কাটিত। কাটার সাথে সাথে আবার পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইত। {এইভাবেই তাহারা ফসল গোলাজাত করিতেছিল।} হুজুর জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? জিবরাঈল উত্তর দিলেন, তাঁহারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ, তাঁহাদের নেকী ৭ শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তাঁহারা যাহা ব্যয় করেন আল্লাহ্ তাআলা উহার বিনিময়ে আরো অধিক সম্পদ দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ উত্তম উপজীবিকাদাতা।

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

দিবে? সর্বশেষে দেখা গেল, এই মহিলাটি ক্ষণস্থায়ী রূপ দেখাইয়া মানুষকে প্রতারণা করিয়াছে, ধোকায় ফেলিয়াছে। মানুষ ভবিষ্যত চিন্তা না করিয়া তাহার মিথ্যা প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। অথচ এখন দেখা গেল, উক্ত মহিলাটির নিকট আগের সেই রূপ আর নাই। সে নিজেই এখন বিশ্রী ও কুশ্রী বৃদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। অনুরূপভাবে দুনইয়াদার হওয়া ও দুনইয়ার প্রেমে পড়া এই বিশ্রী বৃদ্ধার প্রেমে পড়ার সমতুল্য, পরিণামে হায়-হুতাশ ও আফসুস ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না। উপরন্তু মহা আযাবে গ্রেপ্তার হইতে হইবে! সাবধান! ভাই সাহেবান সাবধান!! [উপটীকা শেষ]

{২ নং হাদীস, দ্বিতীয় অংশ ঃ বেনামাযীর শাস্তি}

অতঃপর নবী করীম আরো একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যাহাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছিল। আবার কিছুক্ষণ পরেই ভাল হইয়া যাইত। আবার পূর্বের ন্যায় চুরমার করা হইত। তাহাদের এই শাস্তি এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ ছিল না। জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলে জিবরাঈল বলিলেন, ইহারা ফরয নামায পড়িত না। তাই ইহাদের এই শাস্তি হইতেছে। {১}

উপটীকা ঃ {১} অন্য হাদীসে আসিয়াছে ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى مَضٰى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضٰى عُذِّبَ فِى النَّارِ حُقْبًا-اَلْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلٰثُ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ-مَجَالِسُ الْاَبْرَارِ

অর্থাৎ যেব্যক্তি ওয়াক্ত মত নামায আদায় করিল না অথচ পরে কাযা আদায় করিল, অনুরূপ ব্যক্তিকে শুধু ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায না পড়ার কারণে শাস্তি ভোগ করার জন্য এক হোক্‌বা জাহান্নামে জ্বলিতে হইবে। হোক্‌বা বলে আশি বৎসরকে এবং তিন শত ষাট দিনে এক বৎসর হয়। আর কিয়ামতের একদিন হইবে দুনইয়ার এক হাজার বৎসরের সমান, এই হিসাবে এক হোকবার পরিমাণ হইল দুই কোটি অষ্ট আশি লক্ষ (২,৮৮,০০০০০) বৎসর। –{নাউজু বিল্লাহ। মাজালিছুল আবরার}।

বন্ধুগণ! হাদীস পাকে যে আযাবের কথা শুনিলেন, উহাই হুজুর নিজ চোখে দেখিয়া আসিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

আর একটি হাদীসে হুজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া নামায ছাড়িয়া দিবে বা আদায় করিবে না, সেব্যক্তি কুফরী করিল।

উক্ত হাদীস অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের নিকট উক্ত ব্যক্তি সত্যিই কাফের হইয়া যাইবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের নিকট অনুরূপ ব্যক্তির শাস্তি হইল, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। ইমাম আবু হানীফার নিকট উক্ত ব্যক্তিকে কাফের হইয়া গিয়াছে বলা যাইবে না, তবে তাহাকে বন্দী করিয়া শাস্তি দিতে হইবে। বন্দীখানায় এমন ধরনের মারধর করিতে হইবে যে, নামায আদায় করার অঙ্গীকার করিলে মুক্তি দিয়া দিবে, পুনরায় নামায ছাড়িয়া দিলে আবার বন্দী করিয়া ঐরূপ শাস্তি দিতে থাকিবে, হয়ত নামায পড়িবে না হয় মার খাইতে খাইতে মরিয়া যাইবে। –শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২ ও ইমদাদুল ফতওয়া

হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْئَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهٗ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهٗ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ

অর্থাৎ যেব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করতঃ যথাসময়ে নামায আদায় করিয়াছে এবং ভীত ও বিনীতভাবে উহা সম্পন্ন করিয়াছে, আল্লাহর প্রতি তাহাকে ক্ষমা করার ওয়াদা রহিয়াছে, আর যে ইহা যথারীতি আদায় করে নাই, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে মাফ করিয়াও দিতে পারেন কিম্বা আযাবও দিতে পারেন।

–বোখারী, আহমাদ, আবু দাউদ

{২ নং হাদীস, তৃতীয় অংশ ঃ যাকাত বন্ধকারীদের শাস্তি}

হুজুর আর এক দলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের গুপ্তাঙ্গের উপর আগে ও পাছে লেংটি মোড়ান ছিল। {অভাবের কারণে এই লেংটি ছাড়া আর এতটুকু পুরাতন কাপড়ও মোড়ান ছিল না।} তাহারা পশুর ন্যায় চরিতেছিল এবং যাক্কুম ও দোযখের পাথর ভক্ষণ করিতেছিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোন্ দল? জিবরাঈল উত্তর দিলেন, ইহারা যাকাত প্রদান করিত না। আল্লাহ তাহাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করিতেছেন না, কেননা আপনার মা'বুদ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অত্যাচারী নহেন। {১}

উপটীকা ঃ {১} মহান আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ-بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ-سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

–যাহারা কৃপণতা করে {যাকাত আদায় না করে ও ছদকায়ে ওয়াজিবাত না দেয়}, তাহারা যেন এইরূপ ধারণা না করে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছেন – উহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে; বরং উহা তাহাদের জন্য মহা অমঙ্গলজনক!

–সূরা আলে ইমরান, রুকু ১৮, আয়াত-১৮০

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَوَاتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ-يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ-

–হুজুর ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা যাহাকে ধনসম্পদ দান করিয়াছেন অথচ সে যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তাহার এই ধনসম্পদ

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

{২ নং হাদীস, চতুর্থ অংশ ঃ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি}

ইহার পর এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাদের সম্মুখে এক পাত্রে রান্না করা গোশ্‌ত এবং অপর পাত্রে কাঁচা গোশ্‌ত ছিল। তাহারা রান্না করা গোশ্‌ত না খাইয়া কাঁচা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোন্ সম্প্রদায়?

জিবরাঈল (আঃ) জওয়াব দিলেন, ইহারা আপনার উম্মাতের সেসব লোক, যাহাদের নিকট পূত পবিত্রা হালাল পত্মী থাকা সত্ত্বেও তাহারা নাপাক মহিলাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হইত। যিনার মধ্যে এমন মত্ত ছিল যে, ভোর পর্যন্ত সারা রাত্র লিপ্ত থাকিত। অনুরূপভাবে যে মহিলারা পবিত্র স্বামী রাখিয়া অপর পুরুষদের নিকট গমনাগমন করিত এবং নিজদিগকে ব্যভিচারে বিলাইয়া দিত। {উক্ত মহিলারাও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রহিয়াছে।}

{২ নং হাদীস, পঞ্চম অংশ ঃ আমানাত ও দায়িত্ব পালনে উদাসীন ব্যক্তি}

এরপর হুজুর এক ব্যক্তির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেব্যক্তি বিরাট এক বোঝা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু উঠাইবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তবুও সে বার বার উক্ত বোঝার মধ্যে আরো অতিরিক্ত কাষ্ঠ দিয়া বোঝাকে অত্যধিক ভারী করিয়া উঠাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? জিবরাঈল উত্তর দিলেন, এই লোকটি আপনার উম্মাতের এমন ব্যক্তি, যাহার উপর অনেক

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

বিষধর সাপের রূপ ধারণ করিবে, তাহার চোখে দুইটি কালো চিহ্ন থাকিবে, কিয়ামতের দিন উক্ত সাপ তাহার গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে, অতঃপর সাপ মালদারের চোয়ালে দংশন করিবে এবং বলিতে থাকিবে, আমিই তোমার ধনদৌলত, আমিই তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। – (বুখারী)

বস্তুতঃ যেকোন অন্যায়ের জন্য শাস্তি একই রকমের এবং একই ধরনের হইবে এমন নহে। বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হওয়ার অবকাশ রাখে। [উপ. টী. শেষ]

দায়িত্ব অর্পিত ছিল। মানুষের বহু হক তাহার নিকট আমানাত ছিল। অথচ সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অপারগ হওয়া সত্ত্বেও আরো অধিক দায়িত্ব স্বয়ং নিজেই আপন ঘাড়ে চাপাইয়া লইত।

{২ নং হাদীসের ষষ্ঠ অংশ ঃ পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েজ}

এরপর নবী করীম (সঃ) এমন এক দলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যাহাদের জিহ্বা ও ঠোঁট ধারাল কাঁচি দ্বারা কর্তন করিয়া দেওয়া হইতেছে। কর্তনের সাথে সাথে আবার ভাল হইয়া যাইতেছে। এইভাবেই তাহাদের শাস্তি চলিতেছিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহারা পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েজ, ইহাদের ওয়াজ দ্বারা মানুষ গোমরাহ্ হইত।

{২ নং হাদীস, সপ্তম অংশ ঃ অন্যায় কথায় লজ্জাবোধ}

হুজুর একটি ছোট পাথরের কিনারা দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় উক্ত পাথর হইতে একটি বিরাট গরু সৃষ্টি হইয়া পুনরায় পাথরের ভিতর ঢুকিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই এত ছোট পাথরের অভ্যন্তরে লুকাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, গরুটির এই অবস্থা কেন? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহা ঐ ব্যক্তির ঘটনা আপনি অবলোকন করিতেছেন, যে অন্যায় কথা বলিয়া পরে লজ্জিত হয়। কিন্তু সেই কথাটিকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

{২ নং হাদীস, অষ্টম অংশ ঃ বেহেশতের ধ্বনি শ্রবণ}

হুজুর আকদাস (সঃ) অগ্রসর হইয়া এমন স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে সুরভিত বায়ু ও কস্তুরীর সুগন্ধি ঘ্রাণ আসিতেছিল এবং এক মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের ধ্বনি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহা বেহেশতের আওয়াজ। বেহেশত আল্লাহর সমীপে বলিতেছে, হে আমার মা'বুদ! আমার সহিত যাহা প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন উহা আমাকে প্রদান করুন। কেননা আমার মূল্যবান প্রাসাদ আর রেশমী মখমল, রেশমী কাপড়, পাতলা রেশমী চাদর ও সুন্দরতম মূল্যবান কাপড়ের বিছানা-গদি এবং মণি-মুক্তা, রৌপ্য, গ্লাস, তশ্‌তরী, পেয়ালা, সাওয়ারী, মধু, পানি, দুধ, শরাব {প্রভৃতি সব কিছু} অত্যাধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এখন প্রতিশ্রুত বস্তু (অর্থাৎ বেহেশতী লোকদিগকে) আমাকে প্রদান করুন। (তাহারা আমার এই অফুরন্ত নিয়ামাত ভোগ করুক।) আল্লাহ্ তাআলা বলিলেন, হে বেহেশত! তোমার জন্য প্রত্যেক মুসলমান ও ঈমানদার নর-নারীকে নির্বাচিত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা আমার ও আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আমার সহিত শরীক করে নাই, আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করে নাই। যে আমাকে ভয় করিবে সে নিরাপদে থাকিবে। যে আমার নিকট প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে উহা প্রদান করিব। যে আমাকে করয দিবে আমি তাহাকে উহার প্রতিদান দিব এবং যে আমার উপর ভরসা করিবে আমি তাহাকে যথেষ্ট প্রদান করিব। আমি আল্লাহ্! আমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। নিশ্চয় ঈমানদারগণের সফলতা অর্জিত হইয়াছে। আল্লাহ্! যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা, তিনি বড় বারাকাতময়, কল্যাণকারী। {ইহা শুনিয়া} বেহেশত বলিল, হে আল্লাহ্! আমি সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হইয়া গেলাম।

{২ নং হাদীস, নবম অংশ ঃ দোযখের বিকট শব্দ}

অবশেষে আর এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে মারাত্মক ভীতিজনক একটি বিরাট বিকট শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কিসের শব্দ? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহা দোযখের শব্দ! সে বলিতেছে, হে আল্লাহ্! আমার সঙ্গে যাহার ওয়াদা করিয়াছেন (অর্থাৎ দোযখী দ্বারা ভর্তি করার), উহা আমাকে প্রদান করুন। কেননা আমার শৃঙ্খল, কড়া, অগ্নিশিখা, গরম পানি, পুঁজ ও শাস্তি অনেক

বর্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। আমার গভীরতা এবং আমার উত্তাপ চরম সীমায় যাইয়া উপনীত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, যত মুশরিক ও অবিশ্বাসী কাফের নর-নারী রহিয়াছে এবং যাহারা প্রতিফল দিবসকে বিশ্বাস করে না, আমি তাহাদের সকলকে তোমার জন্য নির্বাচিত করিয়া রাখিয়াছি। {ইহা শুনিয়া} দোযখ বলিল, আমি রাজি হইয়া গেলাম।

(আবু হুরাইরা –তিবরানী ও বাজ্জার)

{৩ নং হাদীস, প্রথম অংশ ঃ ইহুদীর আহবান}

হযরত আবু সাঈদ {রাঃ} হইতে বাইহাকী শরীফে বর্ণিত হাদীস{১}দ্বারা জানা যায়, হুজুর বলিয়াছেন, আমার ডান দিক হইতে কোন এক আহবানকারী আমাকে এই বলিয়া আহবান করিতেছিল, আমার দিকে লক্ষ্য করুন! আমার কিছু বলিবার বিষয় আছে, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করিতেছি। হুজুর বলেন, আমি তাহার কথার কোন জবাব প্রদান করিলাম না।

{৩ নং হাদীস, ২য় অংশ ঃ খ্রীস্টানের আহবান}

অনুরূপ আর একজন আহবানকারী আমার বাম দিকে থাকিয়া আমাকে ডাকিতেছিল, আমি তাহারও কোন উত্তর দিলাম না।

{৩ নং হাদীস, ৩য় অংশ ঃ দুন্ইয়ার আহ্বান}

উক্ত হাদীসে এই ঘটনাটিও উল্লেখ রহিয়াছে যে, এমন একজন মহিলা দৃষ্টিগোচর হইল যাহার হস্ত খোলা অবস্থায় ছিল, তাহার উভয় হস্তে আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রত্যেক প্রকারের নক্শা বিদ্যমান ছিল। সেই মহিলাটি বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমার প্রতি লক্ষ্য করুন! আপনার সহিত কিছু বলিবার আছে। হুজুর বলিলেন, আমি তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপ করিলাম না।

উপটীকা ঃ {১} হাদীসটি খুব লম্বা, কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত।

– বাইহাকী, ২য় খন্ড, ১৩৬-১৪২ পৃষ্ঠা

সেই হাদীসেই রহিয়াছে, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হুজুরকে বলিলেন, প্রথমে যে লোকটি আপনার ডান দিক হইতে আহবান করিয়াছিল, সে হইতেছে ইহুদী আহবানকারী। আপনি যদি তাহার কথার উত্তর দিতেন তাহা হইলে আপনার উম্মাতেরা ইহুদী হইয়া যাইত। আর যে লোকটি বাম দিক হইতে ডাকিতেছিল, সে খ্রীস্টান ধর্মের আহবানকারী। যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন, তাহা হইলে আপনার উম্মাতেরা খ্রীস্টান হইয়া যাইত। অতঃপর যে মহিলাটি আপনি দেখিয়াছিলেন, সে ছিল দুনইয়া (অর্থাৎ তাহার ডাকের জবাব দেওয়ার ক্রিয়া এই হইত যে, আপনার উম্ম্যতগণ দুনইয়াদার হইয়া যাইত এবং পরকাল হইতে ইহকালকে প্রাধান্য দিত। যেইরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে)। (১)

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে।

(২) বাইহাকীর দালায়েল গ্রন্থের হাদীসের শুরুতেই এই শব্দগুলি রহিয়াছে–

فقال لها جبريل مه يا براق فو الله ما ركبك مثله فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مجوزة الخ

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, বোরাকে উঠিয়া চলার সাথে সাথে উক্ত ঘটনাগুলি একের পর এক প্রকাশ পাইয়াছিল। {১}

(৩) ঊর্ধ্ব দিকে উঠিবার ঘটনা বর্ণনার পর ক্রমিক হিসাবে ইহার বর্ণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু পূর্বের ঘটনার সহিত মিল রাখার উদ্দেশে এইভাবে মিলাইয়া বর্ণনা করাই শ্রেয় মনে হইতেছে।

উপটীকা ঃ {১} হযরত থানভীর লিখিত উপরের ২ নং টীকার হাদীসটি হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক হইতে বর্ণিত। বাইহাকী শরীফের যে মূল গ্রন্থ

প্রকাশ্যে বুঝা যায়, উপরোক্ত ঘটনাবলী আসমানে উঠিবার পূর্বেই অবলোকন করিয়াছেন (২), তবে এইখানে এমনও কতগুলি ঘটনা রহিয়াছে যেইগুলি আসমানে উঠিবার পর দেখিয়াছেন। (৩) যাহা বর্ণনার মধ্যেই সুস্পষ্ট রহিয়াছে। যেমন ঃ

{৩ নং হাদীস, ৪র্থ অংশ ঃ হযরত আদমের সহিত সাক্ষাৎ ও হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী দর্শন}

উপরোক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) প্রথম আসমানে তাশরীফ নেওয়ার পর সেইখানে হযরত আদম (আঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। তথায় আরো দেখিলেন যে, অনেক পাত্রে পবিত্র গোশত রাখা হইয়াছে। কিন্তু ভক্ষণকারী কেহই নাই।

পক্ষান্তরে অন্য পাত্রে নাপাক ও পচা গোশত রহিয়াছে, আর অনেক লোক বসিয়া সেইগুলি খাইতেছে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জানাইলেন, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা হালালকে বাদ দিয়া হারাম খাইত। {১}

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

আমার হাতে রহিয়াছে, যাহা অতি আধুনিক কালে ১৯৬৯ ইংরেজীতে মিসরে মুদ্রিত, উহার এবং উপরোক্ত টীকার হাদীসের শব্দের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়, মনে হয় এই পার্থক্য ছাপার কারণে হইয়াছে। সেইখানে ان ও ركبك ও وسار এবং بعجوز প্রভৃতি শব্দগুলি এইভাবে লিখা রহিয়াছে।

—বাইহাকী —২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৩

উপটীকা ঃ {১} কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا

–হে মানব! পৃথিবীতে যাহা আছে উহা হইতে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। – সূরা বাকারা, রুকু-২১, আয়াত-১৬৮

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

–তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিও না এবং অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পত্তি ভোগ করার জন্য জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা মকদ্দমা বিচারকের নিকট দায়ের করিও না। – সূরা বাকারা, রুকু-২৩, আয়াত-১৮৮

পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

১–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দেহের যে গোশ্ত হারাম খাদ্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা বেহেশতে যাইবে না, বরং উহা দোযখেরই উপযোগী। – দারেমী

পর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ-اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يُقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا ... ... ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا يُطِيْلُ السَّفَرُ اَشْعَثَ وَاغْبَرَ يَمُدَّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ-وَمَطْعِمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبَهُ حَرَامٌ وَغِذِى بِالْحَرَامِ-فَاَنّٰى يَسْتَجَابُ لِذَالِكَ-

২-হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো ফরমাইয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কিছু কবুল করেন না। ...... অতঃপর হুজুর দীর্ঘ দিনের প্রবাসী ধুলায় ধূসরিত আর এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এমন এক ব্যক্তির উদাহরণ প্রদান করিলেন, যেব্যক্তি আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া হে মা'বুদ! হে মা'বুদ!! বলিয়া দোয়া করিতেছিল। অথচ তাহার খাদ্য ও পানীয় হারাম ছিল। হুজুর বলেন, এখন কি করিয়া তাহার দোয়া কবুল হইবে? -মুসলিম

مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ-لَمْ يُقْبَلِ اللّٰهُ صَلٰوةً مَادَامَ عَلَيْهِ-

৩-হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ১০ দিরহামে একখানা কাপড় ক্রয় করে অথচ উহার মধ্যে একটি দিরহাম হারামের রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ঐ কাপড় দ্বারা যত নামায পড়িবে, কোন নামায-ই আল্লাহ তাআলা কবুল করিবেন না। -আহমাদ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

৪–হুজুর ফরমাইয়াছেন, যেব্যক্তি জোরপূর্বক এক বিঘত পরিমাণ অপরের জমি দখল করিবে, কিয়ামাত দিবসে সাত তবক যমীন তাহার গলায় লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ–

৫–যে ব্যক্তি যমীনের সীমাচিহ্ন – আইল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, আপন রাহমাত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন। –মুসলিম

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ–

৬–হুজুর ফরমাইয়াছেন, যেব্যক্তি উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি কাটিয়া দিয়াছে, প্রাপ্য অংশ দেয় নাই, আল্লাহ্ তাআলা তাহার বেহেশ্তের অংশ কাটিয়া দিয়াছেন। –ইবনে মাজা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعُ لَابَاسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَّا بِهٖ بَأْسٌ-

৭-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি মুত্তাকী ও পরহেজগার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যায়ের মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে কোন কোন নির্দোষ বস্তু ত্যাগ না করিবে। -তিরমিযী

বস্তুতঃ সন্দেহজনক বিষয় হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে মুত্তাকী হওয়ার রাস্তা সহজ হইয়া যাইবে, বোধহয় এই হাদীস দ্বারা এই দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ-

৮-হুজুর ফরমাইয়াছেন, সত্যবাদী, বিশ্বাসী ব্যবসায়ীর হাশর নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে হইবে। -তিরমিযী

পাঠক বন্ধুগণ! পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এবং অগণিত হাদীসে হালাল ভক্ষণ করার এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশে অত্যধিক কঠোর ভাষায় আদেশ ও নিষেধ করা হইয়াছে। এমনকি নামায, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি ইসলামের বড় ও ছোট সকল প্রকারের ইবাদাত কবুল হওয়া হালাল মালের উপর নির্ভর করে। হারাম খাইয়া নামায পড়িলে বা রোযা রাখিলে কিংবা হারাম মাল দ্বারা হজ্জ করিলে আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ইবাদাত কবুলের জন্য মাল হালাল হওয়া পূর্বশর্ত। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, জোর-জুলুম ইত্যাদি সবই হারাম ও জঘন্য অপরাধ কার্য। এইগুলির স্থান ইসলামে নাই। অন্যায়ভাবে কেহ অপরের মাল ভক্ষণ করিলে আসলে সে যে কি ধরনের বস্তু ভক্ষণ করিল, ইহারই দিকে মি'রাজ হাদীসের এই অংশ ইঙ্গিত করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছে এবং এই সমস্ত মারাত্মক অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকার জন্যই উক্ত ঘটনার উল্লেখ।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যাহার মধ্যে খাদ্য বিধান রহিয়াছে। কোন্ খাদ্য বৈধ আর কোন্‌টি অবৈধ এবং কোন্ বস্তু ভক্ষণ করা যায় আর কোন্‌টি ভক্ষণ করা যায় না, ইসলাম উহার তালিকা নির্ণয় করিয়া জগদ্বাসীর সামনে রাখিয়া দিয়াছে।

শুধু তাই নয়, অবৈধ খাদ্যের জন্য শাস্তির ঘোষণা করিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হয় নাই। বরং মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাআলা সকলের পক্ষ হইতে সকলের সেরা মহানবীকে সসম্মানে নিয়া উক্ত শাস্তির কতিপয় অংশ দেখাইয়া শাস্তির সত্যতা প্রমাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহাই হইতেছে মি'রাজের আর একটি অন্যতম হিকমাত।

(উপটীকা শেষ)

{৩ নং হাদীস, পঞ্চম অংশ ঃ সুদখোরের দর্শন লাভ}

ঐ হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যাহাদের পেট ঘরের ন্যায় দেখাইত, পেটের ভারে তাহারা চলাফেলা করিতে পারিত না। যদিও কেহ উঠিয়া দাঁড়াইত অমনি পড়িয়া যাইত। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুজুরকে বলিলেন, ইহারা সুদখোর উম্মাত। {১}

উপটীকা ঃ{১} আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে ফরমাইয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ—

—যাহারা সুদ গ্রহণ করে তাহারা কিয়ামাতের দিন ভূতাশ্রিত লোকের মত ব্যতীত দাঁড়াইতে পারিবে না। —সূরা বাকারা, রুকু-৩৮, আয়াত-২৭৫

হাদীসে রহিয়াছে—

عَنْ جَابِرٍرَضِ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَبِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ الخ — عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ—عَنْ جَابِرٍرَضِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ—

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

{১} হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের বৎসর, যখন তিনি মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন,

এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ) মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করিয়াছেন।

-(বুখারী ও মুসলিম)

(২) উবায়দ বিন রিফাআহ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামাতের দিন তাকওয়া অনুসারী, পুণ্যবান ও সত্যবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ পাপাচারীরূপে সমবেত হইবে। -তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী

(৩) হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সুদখোর, সুদদাতা, লিখক ও তাহাদের সাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন। -মুসলিম

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاةُ- تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ-فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكَلَةُ الرِّبٰوا

- হুজুর ফরমান ঃ মি'রাজ রাত্রিতে আমি একদল লোকের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহাদের পেটগুলি ঘরের মত, যাহার মধ্যে সর্পে পরিপূর্ণ এবং ঐ সাপগুলি বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- হে জিবরাঈল (আঃ)! ইহারা কোন্ দল? উত্তর দিলেন, ইহারা সুদখোর।

-ইবনে মাজা

{৩ নং হাদীস, ষষ্ঠ অংশ ঃ ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী}

হুজুর আর একটি সম্প্রদায়ের কিনারা দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাদের ঠোঁট উটের ন্যায় ছিল, তাহারা আগুনের টুকরা গিলিয়া খাওয়ার আযাবে লিপ্ত ছিল। সেই জ্বলন্ত আগুনের কয়লা তাহাদের পেটে যাওয়ার সাথে সাথেই মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইত। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, ইহারা ইয়াতীমের মাল জোর করিয়া অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিত। {১}

{ ৩ নং হাদীস, সপ্তম অংশ ঃ যিনাকারিণীর শাস্তি}

অতঃপর হুজুর এমন একদল মহিলার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহারা নিজ স্তনের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শূন্যের মধ্যে লটকিতেছিল। {অর্থাৎ

উপটীকা ঃ {১} আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا-اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا-وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا-

– নিশ্চয়ই যাহারা ইয়াতীমের মাল জোরপূর্বক ভক্ষণ করিতেছে তাহারা অগ্নি ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করিতেছে না এবং খুব তাড়াতাড়িই তাহাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। –সূরা নিসা, রুকু–১, আয়াত–১০

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ-

– হুজুর ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি জোরপূর্বক এক বিঘত পরিমাণ অপরের জমি দখল করিবে, কিয়ামাতে সাত তবক জমি তাহার গলায় লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

স্তনযুগল উপরের দিকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহার দরুন উক্ত মহিলারা যমীন হইতে শূন্যে উঠিয়া লটকিয়া রহিল।} ইহারা যিনাকারিণী মহিলা। {১}

{৩ নং হাদীস, অষ্টম অংশ ঃ চোগলখোরের শাস্তি}

হুজুর চলন্ত পথে আর একদল লোকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাহাদের নিজস্ব পার্শ্বস্থ গোস্ত কাটিয়া তাহাদিগকেই খাওয়ান হইতেছে, ইহারা চোগলখোর, পরোক্ষভাবে অন্যের নিন্দাকারী। {২}

উপটীকা ঃ {১} পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ–

–যিনাকার পুরুষ ও যিনাকারিণী নারী, উহাদের প্রত্যেককে একশত করিয়া কোড়া মার। –পারা ১৮, সূরা নূর, রুকু ১, আয়াত ২

অবশ্য হাদীস শরীফ দ্বারা উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত শাস্তির বিধান হইল, অবিবাহিতা নারী ও অবিবাহিত পুরুষ হইলে একশত কোড়া মারিতে হইবে, আর বিবাহিত পুরুষ ও নারী হইলে তাহাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে। – শামী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০-১৩

{২} আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا–اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ–

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

–কোন কোন অনুমান ও ধারণা পাপে গণ্য, সুতরাং তোমরা কাহারও দোষত্রুটি অনুসন্ধান করিও না এবং একে অপরের গীবত ও নিন্দা গাহিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও কি আপন মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে পছন্দ করিবে? নিশ্চয় ইহা তোমরা সকলেই অপছন্দ কর।

–পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, রুকু–২, আয়াত–১২

হাদীস শরীফে আসিয়াছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةُ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا–فَاِنَّ الرَّجُلَ قَدْيَزْنِى وَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايَغْفِرُ لَهٗ حَتّٰى يَغْفِرُ لَهٗ صَاحِبَهٗ–

–হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা অপরের নিন্দা ও কুৎসা হইতে বিরত থাকিও। কেননা উহা যিনা হইতেও মহাপাপ। অনেকেই হঠাৎ যিনা করিয়া ফেলে, আবার লজ্জিত হইয়া আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে, মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন, পক্ষান্তরে পরনিন্দায় যাহার নিন্দা করা হইয়াছে সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়া যাইবে না। –(ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)

একদা হুজুর (সাঃ) দুইটি কবরের পাশ দিয়া যাইবার কালে ফরমাইলেন ঃ কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি আযাব হইতেছে। তাহাদের আযাব কোন বড় গুনাহর কারণে হইতেছে না, তাহাদের একজন প্রস্রাবের সময় পর্দা করিত না, সতর্ক থাকিত না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখোরী করিত।

{অন্য হাদীসের বর্ণনায় রহিয়াছে, সেব্যক্তি প্রস্রাবের পর নিয়ম মতে পাক হইত না}। [উপটীকা শেষ]

ব্যাখ্যা ঃ আলমে বারযাখ যেখানেই হউক না কেন, যিনি ঘটনা অবলোকন করিতেছেন তাঁহার জন্য সেই স্থানে থাকিয়া ঘটনা দেখা কিংবা সেখানকার বাসিন্দা হওয়া শর্ত নহে। {১}

তাছাড়া এখানে ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, উপরোক্ত ঘটনাবলী আদম আলাইহিস্ সালামের বাম পার্শ্বে গুনাহগারদের রূহ দেখার সময় দর্শন করিয়াছিলেন। যাহার বর্ণনা একটু পরে ১২ নং পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

মি'রাজের কোন কোন ঘটনার বর্ণনা এমনও পাওয়া যায়, যাহা উর্ধ্বে উঠার পূর্বে না পরে ঘটিয়াছিল, ইহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। যেমন– হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুরকে যখন মি'রাজ করান হইয়াছিল, সেই সময় তিনি এমন এমন নবীগণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে কাহারো নিকট মানুষের বিরাট জামাআত ছিল। আবার কাহারো জামাআত একেবারে ছোট ছিল। আর কোন নবী এমনও ছিলেন যাঁহার নিকট কোন লোকই ছিল না। এইভাবে অতিক্রম করিয়া যাইবার কালে তিনি এক বিরাট জামাআতের নিকট উপস্থিত হইলেন। {হুজুর বলেন,} আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কে? উত্তরে বলা হইল, হযরত মূসা ও তাঁহার উম্মাত সকল। আপনার পবিত্র মাথা উপরের দিকে উত্তোলন করিয়া দেখুন! তখন আমি মাথা উঠাইয়া দেখিলাম, এক আজীমুশ্শান জামাআত সমস্ত আকাশ জুড়িয়া রহিয়াছে। অতঃপর আমাকে জানানো হইল, ইহারা আপনার উম্মাত। আপনার উম্মাতের ভিতরে ইহারা ব্যতীত আরো ৭০ হাজার উম্মাত এমন রহিয়াছেন, যাঁহারা বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবেন।

উপটীকা ঃ {১} যেমন টি, ভি, দর্শকেরা ঘটনাস্থলে না থাকিয়া অন্য কোন স্থান হইতে শুধু টি, ভির পর্দায় পূর্ণ ঘটনা দেখিয়া থাকে।

হুজুর ফরমাইলেন; ইহারা সেই উম্মাত যাহারা {মুখে বা শরীরের অন্য স্থানে কিংবা পশুর দেহে} দাগ লাগায় নাই, চিহ্নিত করে নাই। এবং {মন্ত্র দ্বারা ও নাজায়েয পদ্ধতিতে} ঝাড়-ফুঁক দেয় নাই এবং যাত্রা শুভ অশুভ ইত্যাদি মানিয়া চলে নাই। {১} আর নিজের প্রতিপালকের উপর পুরাপুরি ভরসা রাখিত।–তিরিমিযী

উপটীকা ঃ {১} অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে। সব দিবস আল্লাহর। অতএব যাত্রা শুভ অশুভ ইত্যাদি মানিয়া চলা জায়েয নহে। কবুতর উড়াইয়া কিংবা অন্য কিছুর সাহায্যে ভাগ্য ঠিক করা মোটেই বৈধ নহে।
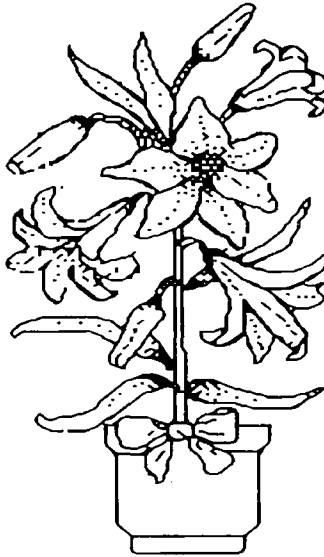
সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাইতুল মুকাদ্দাসে তাশরীফ ও বোরাক বাঁধা

হুজুর বাইতুল মুকাদ্দাসে তাশরীফ আনার পর বোরাক বাঁধা সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর ইরশাদ করিয়াছেন, আমি নিজেই বোরাককে একটি গোলকের {১} সহিত বাঁধিয়া ছিলাম, যাহার সহিত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ (তাঁহাদের সাওয়ারীগুলিকে) বাঁধিয়াছিলেন। –মুসলিম

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বায্‌যারে আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসের একখানা পাথর আঙ্গুল দ্বারা ছিদ্র করিয়া উহার সহিত বোরাক বাঁধিয়াছিলেন। –বাযযার

ব্যাখ্যা ঃ উভয় হাদীসের মিল ও সামঞ্জস্য এইভাবে হইতে পারে যে, পাথরের ঐ গোলক বৃত্তটি বহু পুরাতন যুগ হইতে রহিয়াছে। এখন হয়ত কোন কারণে উহার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আঙ্গুল দ্বারা উহা খুলিয়া দিয়াছেন। আর বোরাক বাঁধিবার সময় উভয় হাযরাত অংশগ্রহণ করিয়াছেন। {সেই জন্য বোরাক বাঁধা সম্পর্কে উভয়ের নাম হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে।}

বোরাক বশীভূত করিয়া পাঠান হইয়াছে, অতএব বোরাক বাঁধার কি দরকার ছিল? এই সন্দেহ করা ঠিক হইবে না। কেননা হইতে পারে, এই জগতে আসার পর এখানকার পশুদের চরিত্র তাহার মধ্যেও বিরাজ করিতেছিল, যদিও ভাগিয়া যাওয়ার ভয় ছিল না, তবুও উহার শওখী– ঔদ্ধত্য ও অন্যান্য কারণে হুজুরের অন্তরে অস্থিরতা আসা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় কার্যের হিকমাত ও জ্ঞানপূর্ণ কার্যকারণগুলি একত্রিত করার ক্ষমতা কাহার আছে?

উপটীকা ঃ {১}একখানা গোলাকার পাথর, যাহার মাঝখান দিয়া এই পাশ হইতে ঐ পাশ পর্যন্ত ছিদ্র ছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামাযের ইমামতি এবং হুর ও আম্বিয়াগণের সাক্ষাৎ

{ক} তাফসীরে ইবনে আবী হাতেমের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর বাইতুল মুকাদ্দাস যাইয়া যখন বাবে মুহাম্মাদ (সঃ)-এ উপস্থিত হইলেন, তখন বোরাক বাঁধিয়া উভয় হাযরাত মসজিদের আঙ্গিনায় আসিলেন। এই সময় জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি বেহেশতের হুর দেখার জন্য নিজ প্রতিপালকের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন কি? হুজুর বলিলেন, হাঁ। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনি এই মহিলাদের নিকট গমন করিয়া সালাম করুন। হুজুর বলেন– আমি তাহাদেরকে সালাম করিলাম, তাহারা আমার সালামের উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহাদের জন্য? তাহারা বলিল, আমরা পুণ্যময়ী, সুন্দরী, আমরা এমন মানুষের পত্নী যাহারা পূত পবিত্র এবং কখনও অপরিচ্ছন্ন হইবে না, সর্বদা বেহেশতে অবস্থান করিবে, কখনও বাহির হইবে না। সর্বদা জীবিত থাকিবে, মরিবে না।

অবশেষে আমি হুরদের নিকট হইতে সরিয়া আসার কিছুক্ষণ পরেই অনেক লোক একত্রিত হইয়া গেল, অতঃপর একজন মুয়াযযিন আযান দিলেন এবং তাকবীর বলিলেন। আমরা সকলেই দাঁড়াইয়া কাতার বাঁধিয়া কে ইমাম হইবেন উহার অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) আমার হাত ধরিয়া ইমামের স্থানে দাঁড় করাইয়া দিলেন। আমি সকলেরই ইমামতি করিলাম। নামায শেষে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলিলেন, আপনার পিছনে কোন্ ধরনের লোকসকল মুকতাদী হইয়া নামায পড়িয়াছেন, উহা কি আপনি অবগত হইতে পারিয়াছেন? আমি বলিলাম, না।{১} জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, দুনইয়াতে যত নবী আলাইহিমুস সালাম প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এখন আপনার পিছনে নামায পড়িয়াছেন।

উপটীকা ঃ {১} ইহা হইতে বুঝা গেল, হুজুর (সাঃ) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নিজের পিছনের খবরও রাখিতেন না।

{খ} বাইহাকী আবু সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি এবং জিবরাঈল বাইতুল মুকাদ্দাসে (মসজিদে) প্রবেশ করিয়াছি এবং উভয়ে দুই রাকআত নামায পড়িয়াছি।

{গ} ইবনে মাসউদের বর্ণনায় আরো একটু অতিরিক্ত বিষয় পাওয়া যায় যে, আমি মসজিদে যাইয়া আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদিগকে চিনিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ দাঁড়ান, কেহ রুকু, কেহ সিজ্দাবস্থায় {অর্থাৎ নামাযে রত} ছিলেন।

অতঃপর একজন মুয়াযযিন আযান দিলেন। আমরা সকলেই কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম এবং কে ইমামতি করিবেন উহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) আমার হাত ধরিয়া সামনে আনিয়া দিলেন। আমি সকলের ইমামতি করিয়া নামায শেষ করিলাম।

{ঘ} মুসলিম শরীফে ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, {হুজুর বলেন,} যখন নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছিল তখন আমি সকলের ইমাম হইয়াছিলাম।

{ঙ} ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (সঃ) যখন মসজিদে আকসায় পৌছিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন সমস্ত পয়গাম্বরগণ তাঁহার সাথে নামায পড়িতে শুরু করিলেন।

{চ} বাইহাকীতে আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (সঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া ফেরেশতাগণের সহিত নামায পড়িয়াছেন (অর্থাৎ এই জামাআতের ইমাম হুজুর হইয়াছিলেন)। (১)

টীকা ঃ (১) হুজুর ইমামুল আম্বিয়া ছিলেন। অতএব নিঃসন্দেহে ইমামুল মালায়েকাও ছিলেন। কেননা নবীগণ ফেরেশতাগণ হইতে অধিক উত্তম।

নামায সমাপ্ত হওয়ার পর ফেরেশতাগণ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথী ইনি কে? জিবরাঈল বলিলেন, ইনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, খাতেমুল আম্বিয়া– সকল নবীগণের শেষ নবী।

ফেরেশতাগণ আবার জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আল্লাহর ওহী (নবুয়াতের জন্য কিংবা আসমানে উঠার জন্য) পাঠান হইয়াছে কি? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, হাঁ। ইহার পর ফেরেশতাগণ বলিলেন, আল্লাহর রাহমাত ও করুণা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক। তিনি খুব উত্তম ভাই এবং শ্রেষ্ঠতম খলীফা (অর্থাৎ আমাদের ভাই এবং আল্লাহর খলীফা– প্রতিনিধি)।

অতঃপর নবীগণের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইল, তাঁহারা সকলেই একে একে আল্লাহর প্রশংসায় বক্তৃতা পেশ করিলেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে খলীল {দোস্ত} উপাধি দান করিয়াছেন এবং বিরাট রাজ্য দান করিয়াছেন। আর আমাকে আনুগত্যকারী ও বিনয়ীদের ইমাম বানাইয়াছেন। অর্থাৎ {অনেক ইবাদাতের মধ্যে} আমার অনুকরণ হইয়া থাকে। সেই মহান আল্লাহ আমাকে (নমরূদের) জ্বলন্ত অগ্নি হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন এবং সেই আগুনকে আমার জন্য শান্তি ও আরামের বস্তু বানাইয়া দিয়াছেন।

তারপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রশংসায় এই বক্তৃতা দান করিলেন যে, সকল প্রশংসা আল্লাহর উদ্দেশে, যিনি আমার সহিত (বিশেষ) কথা বলিয়াছেন এবং তাওরাত কিতাব দান করার জন্য আমাকে মনোনীত করিয়াছেন। ফিরআউনের ধ্বংস আর বনী ইসরাঈলদের মুক্তি আমার দ্বারাই করাইয়াছেন। আমার উম্মাতকে এমন সম্প্রদায় বানাইয়াছেন যাহারা সত্যের উপর থাকিয়া হেদায়াতের কাজ করিতেছে এবং সেইভাবেই ন্যায়ের তুলাদন্ডে ও ইনসাফের সহিত বিচার কার্য চালাইয়া যাইতেছে।

এরপর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসায় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্ধারিত। যিনি আমাকে বিরাট রাজ্য এবং যাবুর কি াবের জ্ঞান দান করিয়াছেন। আমার জন্য লৌহকে নরম ও তরল এবং াাহাড়কে অধীন করিয়া দিয়াছেন। ইহারা আমার সাথে তাসবীহ – আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকে, এমনকি পাখীগুলিকে পর্যন্ত (তাসবীহ পাঠ করার অধীন করিয়াছেন)। তিনি আমাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভাষায় বক্তৃতা করার শক্তি দান করিয়াছেন।

অতঃপর হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বক্তৃতার প্রারম্ভে আল্লাহ্র প্রশংসায় বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি বায়ু ও শয়তানের দলকে আমার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। আমি যাহা ইচ্ছা করিতাম তাহারা উহা তৈয়ার করিয়া দিত। যেমন– বড় বড় দালান-কোঠা ও ছবি {১}। (সেই সময় ছবি তৈয়ার করা জায়েয ছিল। –থানভী) তিনি আমাকে পাখীদের ভাষা বুঝিবার জ্ঞান দিয়াছেন।

সেই মহান আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে সব বস্তুই দান করিয়াছেন। শয়তানের দল এবং মানুষ ও জিন আর উড়ন্ত ও সাঁতারু প্রাণীদেরকে আমার অধীন করিয়া দিয়াছেন। আমাকে এমন পূত-পবিত্র রাজত্ব দান করিয়াছেন যে, আমার পরে কেহই এইরূপ রাজত্ব পাইবে না এবং এই রাজত্ব করা সম্পর্কে আমার কোন হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইবে না। এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

উপটীকা ঃ {১} এই ছবির অর্থ হয়তো প্রাণীর ছবি নহে। যাহা তখনও জায়েয ছিল, এখনও জায়েয আছে। আবার ইহা সুলাইমান নবীর (আঃ) মু'জিযা দেখাইবার ছবিও হইতে পারে। যেইরূপ ঈসা (আঃ) পাখী বানাইয়া আর মৃতকে জীবিত করিয়া মু'জিযা দেখাইয়াছেন। আল্লাহু আলামু।

অবশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁহার বক্তৃতা পেশ করিলেন যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে স্বীয় কালেমা উপাধি দিয়াছেন এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের ন্যায় {পিতাবিহীন} সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি আদমকে মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়া বলিলেন, তুমি (প্রাণবিশিষ্ট) হইয়া যাও। অমনি তিনি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া গেলেন। সেই মহান আল্লাহ আমাকে লেখার শক্তি ও বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবদ্বয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি আমাকে এমন মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, আমি মাটি দ্বারা পাখীর দেহ পুতুল বানাইয়া উহাতে ফুৎকার দিলে তাহা আল্লাহ তাআলার হুকুমে জীবন্ত পাখীতে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আমাকে আরো এমন অনেক অলৌকিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যদ্দ্বারা আমি তাঁহার অনুমতিতে জন্মান্ধকে ভাল এবং শ্বেত কুষ্ঠ রুগীকে অরোগ্য আর মৃতকে জীবিত করিতে পারিতাম। তিনি আমাকে পূত-পবিত্র করিয়াছেন এবং আমি সহ আমার আম্মাজানকে অভিশপ্ত শয়তান হইতে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্যই শয়তান আমাদের উপর তাহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে নাই।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসার উপর তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বলিলেন, আপনারা সকলেই আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছেন, আমিও আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিতেছি। সর্বাধিক প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' {সমস্ত বিশ্ব জগতের করুণা} এবং সকল মানুষের সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহার মধ্যে (প্রকাশ্যেই হউক আর ইঙ্গিতেই হউক, সমস্ত ধর্মীয়) প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। আমার উম্মাতকে উত্তম উম্মাত হিসাবে সকল মানুষের (দ্বীনী) উপকারের জন্য তৈয়ার করিয়াছেন এবং ইনসাফগার, মধ্যমপন্থী উম্মাতরূপে পয়দা করিয়াছেন। উপরন্তু আমার উম্মাতকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা সকলের আউয়ালেও আছে, (অর্থাৎ মর্যাদা ও সম্মানে) এবং আখেরেও আছে (অর্থাৎ শেষ যুগে)।

আমার বক্ষ প্রশস্ত ও বোঝা হালকা এবং আমার আলোচনাকে সমুন্নত করিয়া দিয়াছেন। আমাকে সকলের আরম্ভকারী ও সমাপ্তকারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ নূরের মধ্যে সকলের প্রথমে এবং প্রকাশ হওয়ার মধ্যে সকলের শেষে)।

সর্বশেষে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (সকলকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আপনাদের সকলের ঊর্ধ্বে মহাসম্মানিত হওয়ার জন্য উল্লিখিত বুজর্গী ও কামালাতই যথেষ্ট। এর পর হুজুরের আসমানের উঠার বর্ণনা করিয়াছেন।

আর একটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর শুধু তিন জন নবীর অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নামায পড়ার ও তাঁহাদের হুলিয়ার বর্ণনা দিয়াছেন।

হাদীসে ইহাও রহিয়াছে, যখন আমি নামায সমাপ্ত করিয়াছিলাম, তখন এক সম্বোধনকারী আমাকে বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! ইনি দোযখের দারোগা মালিক, আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহার প্রতি তাকান মাত্র তিনি আগেই আমাকে সালাম জানাইলেন। -(মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হুজুর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মি'রাজ রাতে আমি দাজ্জালকে এবং দোযখের খাযিনকে দেখিয়াছি। -(মুসলিম)

বাইতুল মুকাদ্দাসে দাজ্জালকে দেখার অর্থ তাহার প্রতিচ্ছবি দেখা বুঝিতে হইবে। কেননা সেখানে তাহার অনুপস্থিতি সুস্পষ্ট।

{**বিঃ দ্রঃ**- হযরত থানভী (রাহঃ) এই পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যা নবম পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যার মধ্যে লিখিয়াছেন। উভয় পরিচ্ছেদের ঘটনাবলী বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হওয়ার পরে এবং আসমানে উঠার পূর্বে ঘটিয়াছিল। বোধহয় এই কারণে তিনি এক সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।}

নবম পরিচ্ছেদ

বাইতুল মুকাদ্দাসে দুগ্ধপান

{ক} এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, হুজুর যখন নামায শেষ করিয়া বাহিরে তাশরীফ আনিলেন সেই সময় জিবরাঈল (আঃ) এক পাত্রে শরাব আর এক পাত্রে দুগ্ধ লইয়া হুজুরের সমীপে পেশ করিলেন। হুজুর বলেন, আমি দুগ্ধপাত্রকেই গ্রহণ করিলাম। ইহাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি ফিৎরাত (অর্থাৎ ধর্মীয় পথ) গ্রহণ করিয়াছেন, অতঃপর আসমান পথে উঠিয়া গেলেন। -(মুসলিম)

{খ} ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে আহমাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক পাত্রে দুগ্ধ আর এক পাত্রে মধু ছিল।

{গ} বায্‌যারের বর্ণনায় তিন পাত্রের কথা উল্লেখ হইয়াছে, দুগ্ধ, শরাব ও পানি।

{ঘ} শাদ্দাদ বিন আওসের হাদীসে রহিয়াছে, হুজুর নিজে ইরশাদ করিয়াছেন, নামায পড়ার পর আমার পিপাসা লাগিয়াছিল, তখন এই পাত্রগুলি হাজির করা হইল। আমি উহা হইতে দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিলাম। ইহাতে আমার সামনে যে বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, আপনার বন্ধু ফিৎরাতকেই (ধর্মীয় পন্থা-স্বভাব) গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ বোরাক বাঁধার পর {বাইতুল মুকাদ্দাসে} যেই সমস্ত ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছে (যেগুলির বর্ণনা ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে রহিয়াছে), উহাদের তারতীব বা ক্রমিক বোধহয় এইরূপে হইবে-

১ নং- মসজিদের আঙ্গিনায় পৌঁছিয়া হুরদের সাথে সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ হয়।

২ নং- হুজুর এবং জিবরাঈল (আঃ) দুই দুই রাকআত নামায পড়েন। মনে হয় ইহা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছিল। হয়ত সেই সময় সেখানে অন্যান্য

নবী আলাইহিমুস সালামগণ প্রথমে উপস্থিত ছিলেন, যাঁহাদিগকে হুজুর বিভিন্ন অবস্থায় দেখিয়াছেন, কাহাকেও রুকু, কাহাকেও সিজদাবস্থায় পাইয়াছেন এবং কোন কোন নবীকে চিনিতেও পারিয়াছেন। বোধহয় তাঁহারা সকলে তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ নামায পড়িতেছিলেন। অবশেষে তাঁহারা নিজ নিজ নামায সমাধা করিয়া হুজুরের তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ নামাযেও {বারাকাতের জন্য} মুক্তাদী হিসাবে শরীক হইয়াছিলেন।

৩ নং– অতঃপর অবশিষ্ট সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণ একত্রিত হইলেন।

৪ নং– অবশেষে আযান, তাকবীর ও জামাআত অনুষ্ঠিত হয়। এই জামাআতের ইমাম হুজুর হইয়াছিলেন এবং সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও কতিপয় ফেরেশ্‌তা তাঁহার মুক্তাদী ছিলেন। হুজুর তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন নবীকে চিনিতে পারেন নাই, তাই জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিয়া দিলেন যে, সমস্ত পয়গাম্বর ও রাসূল আলাইহিমুস সালাম আপনার পিছে নামায আদায় করিয়াছেন। এই নামায কোন্‌ নামায ছিল, ইহার ব্যাখ্যা ২৩ নং পরিচ্ছেদে আসিবে {ইনশাআল্লাহ}। আযান ও ইকামাত হয়ত বর্তমানের এই ধরনেরই ছিল, যাহার সাধারণ হুকুম মদীনায় আসার পর কার্যকরী হইয়াছে। অথবা অন্য কোন ধরনের আযান ও ইকামাত হইতে পারে {যাহার বর্ণনা আমরা দিতে পারিব না}।

৫ নং– অতঃপর ফেরেশতাদের সহিত পরিচয় ঘটে। বোধহয় দোযখের দারোগার সহিত এই সময়ই সাক্ষাত হইয়াছিল। আর এই সাক্ষাতেই ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইনি কে? হুজুরের নাম শুনিয়া "তাঁহার নিকট ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি"? ফেরেশতাগণের পুনরায় এই প্রশ্ন ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, তাঁহারা হুজুর সম্বন্ধে পূর্ব হইতে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। ফেরেশতাদের এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দুই প্রকারের কারণ থাকিতে পারে। {ক} নবুয়াত দান করা সম্পর্কে তাঁহাদের কোন জ্ঞান ছিল না, যেহেতু তাঁহারা বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকেন। নানা কাজকর্মের মধ্যে সব

সময় সব কথা মনে থাকে না। কিংবা আগে স্মরণ ছিল, এখন হয়ত স্মরণ নাই। {খ} অথবা নবুয়াতের কথা পূর্ব হইতেই জানা ছিল। তবে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মি'রাজের জন্য তাঁহাকে হুকুম করা হইয়াছে কিনা?

আসমানে উঠার সময় যে সমস্ত প্রশ্ন দরজায় দারোয়ানদের সহিত হইয়াছিল, উহার ব্যাখ্যাও ঠিক এইভাবে হইবে।

৬ নং– এরপর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের সহিত সাক্ষাত।

৭ নং– এরপর সকলের খুৎবা পাঠ বা বক্তৃতা প্রদান করা।

৮ নং– পেয়ালাসমূহের উপস্থিতি।

হাদীসের বর্ণনায় গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জানা যায় যে, চারি প্রকারের পেয়ালা ছিল। দুধ, মধু, শরাব ও পানি। কোন কোন রাবী দুই পেয়ালার উল্লেখই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। কেহ বা তিনটির উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা সেখানে পেয়ালা তিনটাই ছিল, তবে একটিতে পানি ছিল, সেই পানি মধুর মত মিষ্টি হওয়াতে উক্ত পেয়ালাকে কখনও পানি, কখনও বা মধু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শরাব তখন হারাম ছিল না, ইহা মদীনায় আসার পর হারাম হইয়াছে, কিন্তু উহার মধ্যে নিশ্চয় নেশার বস্তু ছিল, সেই জন্য ইহাকে দুনইয়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মধুকেও অধিকাংশ সময় শুধু স্বাদ পাওয়ার জন্যই পান করা হয়, খাদ্য হিসাবে নহে। তাহা হইলে ইহাও একটি অতিরিক্ত বস্তু, উহার স্বাদ ও মিষ্টতা দুনইয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে।

ঠিক তেমনি পানিও আসল খাদ্য নহে {বোধহয় এই জন্যই হুজুর পানি পাত্র গ্রহণ করেন নাই} ইহা শুধু খাদ্যের সাহায্যকারী ও নির্দিষ্টকারীরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। যেরূপভাবে দুনইয়া দ্বীনের জন্য সাহায্যকারী। {দুনইয়া ব্যতীত দ্বীনের কাজ করা যায় না, দুনইয়া ছাড়া দ্বীন হয় না, দুনইয়া দ্বীনের ক্ষেত্র, তা সত্ত্বেও} দুনইয়া উদ্দেশ্য নহে। দ্বীনের দ্বারা রূহের খাদ্য উদ্দেশ্য এবং দুগ্ধ দ্বারা দেহের খাদ্য মাকসুদ।

যদিও খাদ্য বস্তু হিসাবে তথায় দুগ্ধ ব্যতীত অন্য জিনিসও উপস্থিত ছিল, তবুও দুগ্ধকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু উহার মধ্যে খাদ্য ও পানীয় উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। {উহার দ্বারা খাওয়ার কাজও হয় আবার পানের কাজও চলে।}

সিদরাতুল মুন্তাহার পরে এই ধরনের {দুগ্ধ ও শরাবসহ প্রভৃতির} পাত্র হুজুরের সমীপে পেশ করা হইয়াছিল, যাহার বর্ণনা পরে আসিতেছে। সেইখানেও এইভাবের ব্যাখ্যাই করিতে হইবে (হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর এই বিষয় খুব বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন)।

বোধহয় উক্ত বস্তুগুলি বার বার হুজুরের সামনে পেশ করার মধ্যে সতর্ক করার, মজবুতী ও ভয় প্রদর্শনের দৃঢ়তা উদ্দেশ্য ছিল।

৯ নং– এরপর আসমানের দিকে রওনা। {১}

এই ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু তারতীব বা ক্রমিক এবং ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে অবগত হওয়া যায় নাই। ইহা দ্বারা {আরো অনেক কিছু জানা গিয়াছে। যেমন–} উল্লিখিত হাদীসসমূহের পরস্পর বিরোধী বর্ণনার সমস্যা সমাধান হইয়া গিয়াছে এবং সকল সমস্যা রহিত হইয়া সমস্ত বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইয়াছে। "অ-লা আল্লা ইন্দা গাইরী আহ্সানু মিন্ হাযা" হয়ত আমার এই ব্যাখ্যা হইতে উত্তম ব্যাখ্যা অন্য কোন ব্যাখ্যাকারীর নিকট থাকিতে পারে। {থানভী} সম্ভবতঃ এইখানে ফেরেশ্‌তা ও আম্বিয়াগণের উপস্থিতি নবী পাক (সঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য ছিল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

উপটীকা ঃ {১} অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের মি'রাজ ঘটনাগুলি ক্রমিকভাবে সাজাইয়া বলিতে গেলে এইরূপে বলিতে হইবে–

১। সর্বপ্রথম বোরাক বাঁধার কার্য সমাপ্ত।

২। এর পর মসজিদের আঙ্গিনায় উপস্থিতি এবং হুরদের সহিত বাক্যালাপ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

৩। তার পর পৃথকভাবে হুজুর ও জিবরাঈল (আঃ)–এর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাকআত নামায আদায় করা। পূর্ব হইতে কতিপয় পয়গাম্বর আলাইহিমুস সালাম মাসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পাঠে রত ছিলেন। হুজুর তাঁহাদের কোন কোন নবীকে ভিন্ন ভিন্নভাবে নামায পাঠাবস্থায় দেখিয়াছেন।

আর তাঁহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছেন। অবশেষে আম্বিয়াগণ (আঃ) নিজেদের নামায শেষ করিয়া হুজুরের তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাযের পিছে আসিয়া তাঁহার মুক্তাদী হইয়া গেলেন।

৪। উহার পর অবশিষ্ট সমস্ত পয়গাম্বরগণ আসিয়া মাসজিদে উপস্থিত হইলেন।

৫। এর পর আযান, ইকামাত ও জামাআত হইল। এই নামাযে হুজুর ইমাম ছিলেন, আর দুনইয়ার সকল পয়গাম্বর (আঃ) এবং কিছু সংখ্যক ফেরেশতা হুজুরের মুক্তাদী হইয়াছিলেন। হুজুর অনেক পয়গাম্বরকে চিনিতে পারেন নাই। সকলের পরিচয় জিবরাঈল দিয়া দিলেন।

৬। এইবার দোযখের দারোগাসহ অন্যান্য ফেরেশতাদের সহিত সাক্ষাত। এই সময় তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়া হুজুরের পূর্ণ পরিচয় নিয়া নিলেন।

৭। অতঃপর পয়গাম্বর আলাইহিমুস্ সালামগণের সহিত সাক্ষাতলাভ।

৮। তারপর পয়গাম্বরগণের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান।

৯। অবশেষে দুগ্ধ ও শরাবসহ প্রভৃতি পাত্র আনয়ন।

১০। সর্বশেষে আসমানের দিকে রওনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। –অনুবাদক

[উপটীকা শেষ]

দশম পরিচ্ছেদ
আসমানে রওনা

ইহার পর আসমানে উঠিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, বোরাকে চড়িয়াই হুজুর আসমানে তাশরীফ নিয়াছিলেন।

{১} বুখারীর মধ্যে রহিয়াছে, হুজুর ইরশাদ করিয়াছেন, আমার কলব ধৌত করিয়া উহাতে ঈমান ও হিকমাত দ্বারা পূর্ণ করার পর আমাকে বোরাকের উপর আরোহণ করানো হইয়াছিল। যাহার এক একটি কদম তাহার দৃষ্টি স্থানের শেষ প্রান্তে যাইয়া পড়িত। অতঃপর জিব্‌রাঈল আমাকে লইয়া চলিলেন। আমরা দুন্‌ইয়ার আসমানে যাইয়া পৌছিলাম।

এই বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, বোরাকের উপর উঠিয়া আসমানে গিয়াছিলেন। যদিও কিছু সময়ের জন্য মাঝপথে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করিয়াছিলেন।

{২} বাইহাকীতে আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের সমুদয় কার্যের পর) আমার সম্মুখে একটি 'যীনাহ্' বা সিঁড়ি আনা হইল। যাহার উপর আদম সন্তানদের রূহ (মৃত্যুর পর) চড়িয়া থাকে। এই 'যীনাহ্' হইতে অধিক সৌন্দর্য সৃষ্টির আর কিছুই নজরে পড়ে নাই। আপনি (কোন কোন) মৃত ব্যক্তিকে চক্ষু খুলিয়া আসমানের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিবেন। সেব্যক্তি এই 'যীনাহ্' দেখিয়া খুশী হইয়া যায়।

{৩} 'শরফে মুস্তাফা' কিতাবে রহিয়াছে যে, এই যীনাহ্ 'জান্নাতুল ফিরদাউস' হইতে আনা হইয়াছিল। উহার ডানে, বামে, উপরে ও নীচে ফেরেশতা দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

{৪} কা'বের বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুজুরের জন্য একটি রৌপ্য ও আর একটি স্বর্ণ যীনাহ্ রাখা হইয়াছিল। হুজুর ও জিবরাঈল উহাতে আরোহণ করিলেন।

{৫} ইব্‌নে ইসহাকের রেওয়ায়েতে রহিয়াছে, হুজুর ইরশাদ করিয়াছেন, আমি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কার্যাবলী হইতে অবসর হইয়াছিলাম, সেই সময় এই যীনাহ্ আনা হয়। আমার পথের বন্ধু (জিবরাঈল) আমাকে উহার উপর উঠাইয়া বসাইয়া দিলেন। ইহার পর উহা আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ বোরাক ও যীনাহ্র বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে হইতে পারে যে, কিছু দূর একটির উপর আবার কিছু দূর আর একটির উপর তাশরীফ রাখিয়া আসমানে উঠিয়াছিলেন। যেরূপভাবে সম্মানিত মেহমানের জন্য কয়েক ধরনের যানবাহন তাঁহার সমীপে হাজির করা হয়। মেহমান আপন ইচ্ছায় কিছু দূর ইহার উপর, আবার কিছু দূর উহার উপর চড়িয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে থাকেন। সকল প্রকারের যানবাহনে কিছু কিছু সময় আরোহণ করা তাঁহার এখতিয়ার ও ইচ্ছা। {১}

বোরাক অবশ্যই মহা দ্রুত গতিবিশিষ্ট সাওয়ারী ছিল। তবুও তাহার চলন ও থামন, গতি ও স্থিরতা আরোহণকারীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। কেননা বোরাকে আরোহণ করার পর বিভিন্ন স্থানে অবতরণ ও বিভিন্ন ধরনের বস্তু অবলোকন করা ও উহা সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হওয়া এবং উহার নিকট দিয়া গমন করা, প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রমাণ করিতেছে যে, ভ্রমণ একচ্ছত্রভাবে আরোহণকারীর আয়ত্তে ছিল।

উপটীকা ঃ {১} বোরাক ও 'যীনাহ'তে আরোহণ করার আরো ব্যাখ্যা হওয়ার অবকাশ রাখে।

১। হয়ত ইহা রূপালী ও সোনালী রংয়ের এক প্রকারের স্বর্গীয় গদিবিশেষ। ইহা বোরাকের উপর বসাইয়া তাহার উপর হুজুরকে বসান হইয়াছিল। এই গদি বসানো আবার দুই প্রকারে হইতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

{ক} সম্ভবতঃ বোরাকের জন্য দুই প্রকারের গদি নির্বাচন করা হইয়াছে, একটিতে বসিয়া হুজুর বাইতুল মুকাদ্দাস যাইবেন, সেইখানে যাইয়া পূর্ব গদি পরিবর্তন করিয়া আরেকটি নূতন গদিতে বসিয়া আকাশে তাশরীফ নিবেন, এই গদিটির নামই হইতেছে 'যীনাহ'। ইহা আসমানে উঠার গদি। ইহাতে বুঝা গেল, আসমানে উঠিবার জন্য বোরাক ঠিকই রহিয়াছে, শুধু গদির পরিবর্তন হইয়াছে।

{খ} পূর্বের গদি পরিবর্তন না করিয়া উহার উপরে 'যীনাহ্' বসাইয়া তাহার উপর হুজুর তাশরীফ রাখিয়া ঊর্ধ্ব দিকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে।

২। ইহা গদি নহে; বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নভোযান। ঊর্ধ্ব দিকে উঠিবার সময় মাঝে মাঝে এমন স্তর রহিয়াছে যেইখানে বোরাকে চড়িয়া যাওয়া যায় না, বোরাক হইতে নামিয়া যাইতে হয়। তারপর কিছু দূর যাইয়া আবার বোরাকে উঠিত হয়। এই বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহের জন্য যীনাহতে আরোহণ করিতে হইয়াছে।

বোধহয় একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিয়া নিলে আরো সহজ হইবে। যথা– রিক্সা অথবা বাস কিংবা নৌকাযাত্রীরা রাস্তায় কোন অসুবিধা থাকিলে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য দূর হাঁটিয়া আবার নিজ নিজ যানবাহনে উঠিয়া থাকেন।

৩। ইহা গদিও নহে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরোহণ করিবার যানও নহে। বরং ইহা বোরাক চড়িবার আসমান যান। হুজুর বোরাক হইতে নামিয়া যান নাই, বরং বোরাকের পিঠে বসিয়া রহিয়াছেন আর বোরাক যীনাহয়ের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। **(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)**

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

এই সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুজুরের সামনে বোরাকের উপর বসিয়া গেলেন। অথবা জিবরাঈল হুজুরের একেবারে কাছে বোরাকের উপর না বসিয়া বোরাকের সম্মুখে যাইয়া যীনাহ-এর মধ্যে বসিলেন এবং যীনাহকে পথ দেখাইতে লাগিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে আসমানের সমস্ত পথ এই নিয়মে অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা হইতেছে হুজুরের সামনে জিবরাঈল বসার আর একটি ব্যাখ্যা।

অথবা আসমানের সমস্ত রাস্তা বোরাক যীনাহর উপর আরোহণ করিয়া অতিক্রম করে নাই। শুধু মাঝে মাঝে মহাশূন্যের কোন কোন স্তর পার হইবার সময় বোরাক যীনাহতে চড়িয়া পার হইয়াছিল। উভয় অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বোরাকের উপর বসা ছিলেন। অতএব হুজুর বোরাকে আরোহণ করিয়া এবং যীনাহতে চড়িয়া আসমানে উঠিবার উভয় হাদীস আল্লাহর রহমতে নিজ নিজ স্থানে ঠিকই আছে। কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নাই।

এই ব্যাখ্যাটি নিম্নলিখিত উপমা দ্বারা আরো পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যথা– পৃথিবীর বহু বড় বড় সড়কের মাঝে মাঝে সেতুবিহীন নদী রহিয়াছে। সেই সকল নদীতে যাত্রীসহ বাস ও ট্যাক্সী পারাপারের জন্য ফেরীর ব্যবস্থা আছে। যাত্রীগণের অনেকেই বাস ও ট্যাক্সী হইতে অবতরণ না করিয়া ফেরী পার হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ফেরী পারাপারের সময় যাত্রীগণের কেহ কেহ বাস ও ট্যাক্সী হইতে নামিয়া ফেরীতে অবস্থান করেন। আবার অনেকেই অবতরণ না করিয়া নিজ নিজ যানবাহনে আপন আসনে বসিয়া থাকিয়া ফেরী পার হইয়া যান। অতএব যাত্রীগণ গন্তব্যস্থানে বাসে বা ট্যাক্সীতে গিয়াছেন, ইহাও ঠিক। আবার তাঁহারা ফেরীতে গিয়াছেন তাহাও ঠিক। এইখানে বাস ও ট্যাক্সীকে বোরাকের সহিত এবং ফেরীকে যীনাহর সহিত উদাহরণ দিলে ব্যাখ্যাটি অতি সহজে বুঝে আসিবে বলিয়া মনে করি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী। –অনুবাদক

একাদশ পরিচ্ছেদ
প্রথম আসমানে বিশ্বনবী

{১} হযরত নবী করীম (সঃ) জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সহিত প্রথমে দুনইয়ার আসমানে যাইয়া পৌছিলেন। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আসমানের দরজা খোলাইয়া লইলেন। (দরজাসমূহের রক্ষী ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে) জিজ্ঞাসা করা হইল কে? উত্তরে বলা হইল, জিবরাঈল। পুনরায় প্রশ্ন করা হইল, আপনার সাথে কে? জিবরাঈল বলিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার নিকট আল্লাহ্র ওহী (নবুয়াতের অথবা আসমানে আসার জন্য) প্রেরিত হইয়াছে কি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, হাঁ। –বুখারী

{২} বাইহাকীতে আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আসমানের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি দরজায় যাইয়া পৌছিলেন। যাহার নাম باب الحفظه "সুরক্ষিত দ্বার", সেখানে এক ফেরেশতা নির্দিষ্ট আছেন। তাঁহার নাম ইসমাঈল। তাঁহার অধীনে বার হাজার ফেরেশতা রহিয়াছেন।

{৩} শরীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত বুখারীর হাদীসে এই কথাও রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যমীনে কি কাজ করার ইচ্ছা করেন উহার কোন খবর আসমানবাসীদের থাকে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে কোনভাবে জানাইয়া দেওয়া না হয়।

যেমন– এইখানে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের কথায় তাহাই বুঝা গিয়াছে এবং উহা দ্বারা "তাঁহার নিকট আল্লাহ্র ওহী পৌছিয়াছে কি?" ফেরেশতাদের এই প্রশ্নটি করার কারণও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

এই জিজ্ঞাসা করার মধ্যে যে দুইটি কারণের উল্লেখ হইয়াছে, উহার বিস্তারিত বর্ণনা অষ্টম পরিচ্ছেদের পঞ্চম নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করার কারণ সম্বন্ধে সেইখানে আকলী দলীল লেখা হইয়াছে। এইখানকার এই নকলী দলীল দ্বারা ঐ আকলী দলীলের {অর্থাৎ– ক– ফেরেশ্তাদের নবুয়াতের জ্ঞান ছিল না, কিংবা জানা ছিল, তবে এখন স্মরণ নাই। খ– নবুয়াত সম্পর্কে জানা আছে এবং স্মরণও রহিয়াছে, তবে মি'রাজ সম্পর্কে কিংবা আসমানে উঠা সম্বন্ধে জানা নাই।} ব্যাখ্যা আরো সুদৃঢ় হইল।

{৪} বুখারীর বর্ণনায় রহিয়াছে, {অর্থাৎ তিনি মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁহার নিকট ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে।} এই কথা শুনিয়া মারহাবা! ধন্যবাদ! আপনি অনেক উত্তমভাবে তাশরীফ আনিয়াছেন বলিয়া ফেরেশতাগণ দরজা খুলিয়া দিলেন।

আদমের দর্শন

{ক} হুজুর ফরমান, আমি তথায় {প্রথম আসমানে} পৌঁছিয়া হযরত আদম আলাইহিস সালামকে উপস্থিত পাইয়াছি। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, ইনি আপনার পিতা আদম, তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জওয়াব ফরমাইলেন এবং মহৎ সন্তান ও মহানবী বলিয়া মারহাবা দিলেন– ধন্যবাদ জানাইলেন।

{খ} অন্য এক বর্ণনায় আছে, দুন্ইয়ার আসমানে এক ব্যক্তিকে বসা অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। যাঁহার ডান দিকে কিছু আকৃতি এবং বাম দিকে কিছু আকৃতি দেখা যাইতেছিল। যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসিয়া উঠেন, আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদিতে থাকেন।

আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? জিবরাঈল বলিলেন, ইনি আদম (আঃ)। ডান ও বামের এই আকৃতিগুলি তাঁহার সন্তানদের আত্মার আকৃতি। ডান দিকের আত্মাগুলি বেহেশতী এবং বাম দিকেরগুলি দোযখী। তাই তিনি ডান দিকে দেখিয়া হাসেন এবং বাম দিকে দেখিয়া কাঁদেন। -(মিশকাত ঃ বুখারী ও মুসলিম)

{গ} বায্যারের মধ্যে আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তাঁহার {আদমের} ডান দিকে একটি দ্বার ছিল, উহা হইতে সুগন্ধ আসিত এবং বাম দিকে আর একটি দ্বার ছিল, উহা হইতে দুর্গন্ধ বায়ু আসিত। যখন তিনি ডান দিকে দেখিতেন খুশী ও আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেন, আর যখন বাম দিকে দেখিতেন তখন অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন।

নীল ও ফোরাত

উপরোল্লিখিত শরীকের (রাঃ) হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যে, হুজুর দুন্ইয়ার আসমানে নীল ও ফোরাত নদীদ্বয় দর্শন করিয়াছেন।

হাউজে কাউসার

এই {শরীক রাঃ} হাদীসের বর্ণনায় আরো জানা যায়, হুজুর দুনইয়ার আসমানে অপর একটি পানির নালা দেখিতে পাইয়াছেন। যাহার উপর {কিংবা দুই পাশে} মণি-মুক্তা ও যবরজদ পাথরের তৈয়ারী গৃহ ছিল, উহাই কাউসার নামীয় নালা।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্ন- এই আসমানে সাক্ষাতের পূর্বে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সকল পয়গাম্বরগণের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলেন। আবার তিনি নিজ কবরেও রহিয়াছেন। {একই মানুষ এক সঙ্গে তিন স্থানে,} ইহা কি করিয়া সম্ভব? ঠিক এই একই ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হয় অন্যান্য পয়গাম্বরগণের (আঃ) বেলায়ও। যাঁহাদিগকে হুজুর অবশিষ্ট আসমানসমূহে দেখিয়াছেন।

ইহার জওয়াব এই হইতেছে যে, তাঁহারা আসল দেহ লইয়া কবরে তাশরীফ রাখিয়াছেন, কবর ছাড়া অন্যান্য স্থানে রূহের তামছিল বা আত্মার রূপ- আকৃতি আকারে {কিংবা প্রতিকৃতিরূপে} দর্শনে হাজির হইয়াছিলেন। অর্থাৎ দেহের মূল পদার্থ ও মৌলিক উপাদান ব্যতীত উপমাস্বরূপ আর একটি সূক্ষ্ম দেহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যাহাকে সুফীগণ 'জিসমে মিছালী' উদাহরণীয় দেহ {বা দেহের প্রতিকৃতি} বলিয়া থাকেন। উহার সহিত রূহের সম্বন্ধ জড়িত হইয়াছিল। {১}

উপটীকা ঃ {১} ইহার আর একটি জওয়াবও হইতে পারে যে, সাধারণভাবে কবরেই আছেন, তবে প্রয়োজনবশতঃ কবর শূন্য করিয়া কোন বিশেষ কাজে, বিশেষ স্থানে আল্লাহর হুকুমে যাইয়া থাকেন। যেমন- মি'রাজ রাত্রিতে হুজুরকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়াছিলেন। যতক্ষণ বাইতুল মুকাদ্দাসে ছিলেন ততক্ষণ আসমানে ছিলেন না এবং কবরেও ছিলেন না। আবার যখন আসমানে গিয়াছেন তখন কবর ও বাইতুল মুকাদ্দাসে ছিলেন না। অতএব বুঝা গেল, এক সঙ্গে সব স্থানে ছিলেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হুজুরের কবর শরীফে এইরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। হুজুরের ইন্তেকালের বহু বৎসর পরে সৈয়দ আহমাদ কবীর রেফায়ী (রহঃ) নামে হুজুরের বংশের এক আশেকে রাসূল আসিয়া হাত মুবারাক বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য হুজুরের সমীপে আরজ করিলেন, অমনি হুজুর পবিত্র হাত মুবারাক কবর শরীফ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। রেফায়ী (রাহঃ) সাহেব মহানন্দে হুজুরের হাত মুবারাক চুম্বন করিলেন। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ) সাহেবসহ এই ঘটনা ৯০ হাজার লোকে দেখিয়াছিলেন। হাত মুবারাক যখন কবরের বাহিরে আসিয়াছিল, তখন কবর পবিত্র হাত হইতে খালি ছিল। ইহাই আমার এই ব্যাখ্যার মূল বক্তব্য। আল্লাহ ভাল জানেন। [উপটীকা শেষ]

এক রূহের জন্য এই রকমের উদাহরণীয় দেহ {স্থূল জড় পদার্থ ব্যতীত সূক্ষ্ম দেহ ও প্রতিকৃতি} একাধিক হওয়া এবং রূহ একই সময়ে সকল দেহের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব। তবে ইহা রূহের ইচ্ছাধীন নহে, বরং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। {১}

উপটীকা ঃ {১} যখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হইয়া থাকে, তখন অসম্ভব বলিতে কিছুই নাই, সবই সম্ভব। তবে ইহার দৃষ্টান্ত দুনইয়াতে অনেক রহিয়াছে।

১ নং– একজন মানুষের কয়েকটি ছায়া হওয়া সম্ভব এবং প্রত্যেকটি ছায়ার সহিত একই সময়ে দেহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাও সম্ভব। যথা– কোন এক লোকের চারিদিকে হারিকেন জ্বালান হইলে একই সঙ্গে লোকটির চারিটি ছায়া হইবে। সে দাঁড়াইলে ছায়াগুলিও দাঁড়াইবে, সে বসিলে ছায়াগুলি বসিবে। অর্থাৎ সে যাহা করিবে ছায়াগুলি তাহাই করিবে। ইহাতে প্রমাণিত হইল, একজন মানুষের অনেকগুলি ছায়া হইতে পারে এবং প্রত্যেকটি ছায়ার সহিত মূল দেহের সম্পর্ক ঠিক থাকিবে।

প্রকাশ থাকে যে, দেহের নড়াচড়া প্রকৃতপক্ষে রূহের দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব রূহের সম্পর্ক দেহের মাধ্যমে ছায়ার সহিত হইয়া গেল।

২ নং– এক মানুষের হাজার হাজার ছবি বা ফটো হইতে পারে। প্রত্যেকটা ছবি একই ধরনের, একই রকমের, একই আকৃতির এক মানুষ। দেখিতে সব এক রকম। নাই শুধু বিভিন্ন পদার্থ ও মৌলিক উপাদান এবং রূহ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে নবীর মধ্যেও মৌলিক উপাদানসহ রূহ আসা সম্ভব।

৩ নং– আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে টেলিভিশনের মধ্যে অথবা অন্য মেশিনের সাহায্যে কাপড়ের পর্দায় কিংবা বিশেষ স্থানে ছবিকে সাধারণ মানুষের ন্যায় করিয়া স্বাভাবিক পর্দায় দেখান সম্ভব হইয়াছে। ছবি আসল মানুষের মত চলাফেরা ও কথাবার্তা সবই পারে। তবে তার দেহ এই — নহে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

প্রকাশ্যভাবে বুঝা যাইতেছে যে, পয়গাম্বর আলাইহিমুস সালামগণের এই উদাহরণীয় দেহ {বা প্রতিকৃতি} দুই স্থানে দুই ধরনের আকৃতিতে ছিল। সেই জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে সাক্ষাত হওয়ার পরেও হুজুর আসমানে আসিয়া তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই। {১}

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

৪ নং– দুনইয়াতে মানুষ শয়ন কক্ষে থাকিয়া অন্য স্থানে নিজেকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকে। নিজের আসল দেহকে শয়ন কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া আর একটি দেহ লইয়া হাজার হাজার মাইল দূরে চলিয়া যায়। সে ব্যক্তি স্বপ্ন স্থানে যাইয়া নিজের দেহ লইয়া বিচরণ করে। সে মনে করে, আমার আসল দেহ এই হাজার হাজার মাইল দূরে আমার সাথেই আছে, ইহা তাহার অন্য আরেকটি দেহ, এই কথা সে মোটেই বুঝে না। এখন কথা হইতেছে, উভয় দেহের সহিত তাঁহার রূহের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাহা না হইলে রূহের অভাবে বাড়ীর দেহ মারা যাইত, অথবা দূরের দেহ কিছুই দেখিত না এবং কিছুই বুঝিত না।

৫ নং– সূর্য মাত্র একটি। লক্ষ লক্ষ আয়নার মুখ উহার দিকে ধরিলে দেখা যাইবে, প্রতিটি আয়নার ভিতর এক একটি গোটা সূর্য, যতগুলি আয়না ততগুলি সূর্য। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে আয়নার প্রত্যেক সূর্যের সঙ্গে আসল সূর্যের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আসল সূর্য ঘুরে তাই আয়নার সূর্য ঘুরে, আসল সূর্যের উপর মেঘ ঢাকা পড়িলে আয়নার সূর্যের মধ্যেও মেঘ ঢাকা পড়িবে। ঠিক তেমনি আসল সূর্যে গ্রহণ লাগিলে আয়নার সূর্যেও গ্রহণ লাগিবে। **[পূর্ব পৃষ্ঠার উপটীকা শেষ]**

উপটীকা ঃ {১} না চিনিবার কারণ অনেক হইতে পারে। যেমন–

{ক} বাইতুল মুকাদ্দাসে দেখা হইয়াছে ঠিক, কিন্তু ফেরেশ্‌তা, হুর এবং নবীগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের কয়েক জনকে বাছিয়া ঠিক করিয়া রাখেন নাই। **পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য**

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

{খ} আসমানে প্রথমে দূর হইতে দেখিয়াছেন। সেই জন্য চিনিতে পারেন নাই। জিবরাঈল (আঃ) বলার পর এবং নিজেও কাছে আসার পর ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছেন। তাই এই ব্যাপারে দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের দেখা ও আসমানের দেখা একই আকৃতিতে ছিল। সেই জন্যই হুজুর জিবরাঈল (আঃ)-কে এই প্রশ্নটি– "আম্বিয়াগণের আকৃতি দুই রকমের হইল কেন? বাইতুল মুকাদ্দাসে এ রকম, এইখানে দেখিতেছি আর এক রকম, ইহা কেন?" ইত্যাদি কোন প্রশ্ন করেন নাই। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, হুজুর তাঁহাদিগকে উভয় স্থানে একই আকৃতিতে দেখিয়াছেন। তাই কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

{গ} একটি হইল দুনইয়ার দেখা, আরেকটি হইল আসমানের দেখা। দুই দেখায় দুই জগতের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এইরূপ ঘটিয়াছে। আসমানে হয়ত তাঁহাদের শান-শওকত ও পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন ধরনের ছিল। সেই জন্য চিনিতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বেহেশ্তী লোকেরা বেহেশতে দুনইয়ার বৃদ্ধের আকৃতিতে থাকিবেন না। সেইখানে তাঁহারা যুবক হইয়া যাইবেন। এইখানেও মনে হয় অনুরূপ কিছু হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

{ঘ} একই পানি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন– ১–পুকুর ও খালে, নদী ও সাগরে তরল, ২–উত্তাপে বাষ্প ও বায়ু, ৩– আকাশে মেঘ, ৪–এবং অধিক ঠান্ডায় বরফ। সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে এবং স্থানের বিভিন্নতায় কোন কোন বস্তুর রং ও আকৃতির পরিবর্তন হইয়া থাকে। এমনকি কখনও নামের পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। যথা– পানি ও দুধের রূপান্তরিত হওয়া। নবীগণকে না চিনার ব্যাপারে হয়ত এইরূপ কিছু ঘটিয়াছে। আল্লাহ ভাল জানেন। [উপটীকা শেষ]

হাঁ, হযরত ঈসা (আঃ) যেহেতু সশরীরে আসমানে রহিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে তথায় সশরীরে আসল দেহে দর্শন করা অসম্ভব নহে। যদি কথা এই হয়, তাহা হইলে বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁহার (ঈসার) সহিত সাক্ষাত করা জড় দেহে ছিল না; বরং উহা উদাহরণীয় দেহে ছিল। তাঁহাকে দর্শনের বিবরণ অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে।

মৃত্যুর পূর্বে উদাহরণীয় দেহের {ও প্রতিকৃতির} সহিত রূহের সম্পর্ক হওয়া (যথা– ঈসার (আঃ) হইয়াছে) অলৌকিক ঘটনা হিসাবে সম্ভব। {১}

যদিও এইখানে এই কথাও সম্ভব যে, {ক} বাইতুল মুকাদ্দাসে হযরত ঈসার সহিত সাক্ষাত সশরীরে ছিল, তিনি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। {খ} অথবা উভয় স্থানে সশরীরে সাক্ষাত হইয়াছিল। প্রথমে

উপটীকা ঃ

{১} মানুষ এই পৃথিবীতে নিজেকে স্বপ্নে উদাহরণীয় দেহে দেখিয়া থাকে। সে যেখানে তাহাকে স্বপ্নে দেহ সহ দেখিতেছে, আসলে ইহা তাহার দেহ নহে। আসল দেহ শয়নকক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। এই স্বপ্ন আবার দুই ধরনের হইয়া থাকে।

{ক} নিজেকে আসল আকৃতিতে দেখে।

{খ} অথবা অন্য আকৃতিতে দেখে। যেমন– কোন যুবক নিজেকে বৃদ্ধের বা বালকের আকৃতিতে স্বপ্নে দেখিল। কেহ বা রোগগ্রস্ত দেখে, আবার কেহ বা পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িতে দেখে। ঠিক তেমনি এক লোক অন্য লোককে বিভিন্ন আকৃতিতে বিভিন্ন স্থানে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। এমনকি মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা সম্ভব। প্রতিটি দেহের সহিত রূহের সম্পর্ক রহিয়াছে। **[উপটীকা শেষ]**

আসমান হইতে বাইতুল মুকাদ্দাসে আসিয়াছেন পরে আবার তথা হইতে আসমানে পৌছিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত এবং বাস্তব বিরোধী।{১} আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আদম আলাইহিস্ সালামের ডানে এবং বামে যে সমস্ত ছবিগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেইগুলি রূহের প্রতিকৃতি ও উদাহরণীয় ছবি ছিল।

উপটীকা ঃ {১} কেননা এই ব্যাখ্যা দ্বারা অন্যান্য বাহ্যিক বিরোধ ছাড়াও দুইটি বাস্তব পরস্পর বিরোধী ঘটনার উদ্ভব হইতেছে।

{ক} ঈসার (আঃ) সশরীরে যমীনে নামিয়া আসা আবার চলিয়া যাওয়া, যেহেতু তিনি মাত্র একবার সশরীরে দুনইয়ায় আসিবেন, তাহাও দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য এবং পুনরায় আর আসমানে জিন্দাবস্থায় ফিরিয়া যাইবেন না। দ্বিতীয়তঃ আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মি'রাজ রজনীতে তাঁহাকে আনা নেওয়ার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা ও কোন যানবাহনের উল্লেখ হাদীসে নাই, যাহা শরীরের বা জড় দেহের জন্য অতীব প্রয়োজন।

যথা– হুজুরের জন্য বোরাক ও যীনাহ্ সহকারে জিবরাঈল (আঃ) ও অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে পাঠান হইয়াছিল। অতএব ঈসা (আঃ) আসল দেহে দুনইয়াতে আসেন নাই। দাজ্জালকে হত্যার জন্য ঈসা কিভাবে, কাহার সাহায্যে, কোথায় সশরীরে তাশরীফ আনিবেন, ইহার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসে আছে।

{খ} হুজুর যাঁহাকে আসল দেহে বাইতুল মোকাদ্দাসে দেখিলেন যদি তাঁহাকে সেই দেহে এবং সেই আকৃতিতে আবার আসমানে দেখেন, তাহা হইলে না চিনিবার কারণ কি থাকিতে পারে? ইহাতে বুঝা গেল, ঈসা আলাইহিস্ সালাম বাইতুল মোকাদ্দাসে জড় দেহের শরীরে ছিলেন না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। **[উপটীকা শেষ]**

উপরোল্লিখিত বায্যারের বর্ণনায় গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই কথাটি পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সমস্ত রূহগুলি তখন আসমানে বিদ্যমান ছিল না। বরং উহারা {আসমান ছাড়া অন্য কোথাও} নিজ নিজ ঠিকানায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতেছিল। আদম আলাইহিস্ সালামের স্থান আর রূহদের থাকার স্থানের মধ্যখানে দরজা ছিল। সম্ভবতঃ সেই দরজা দিয়া রূহসমূহের প্রতিবিম্ব ও প্রতিকৃতি ছবি আকারে আদম আলাইহিস্ সালামের দুই পাশে আসিয়া পড়িত।

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত যে বায়ু আসিতেছিল, প্রকৃতপক্ষে উহাও দেহাকৃতিতে ছিল এবং সম্ভবতঃ উহার মধ্যে প্রতিচ্ছবি ও প্রতিকৃতির শক্তি বিদ্যমান ছিল।

যথা– বায়ু আলোকরশ্মির সহিত মিলিত হইয়া বর্ণনাযোগ্য হয়। কেননা এই হাদীসের বর্ণনার মধ্যে দরজার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। আর ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, ছবি আসিয়া পতিত হওয়ার জন্য এই দরজা মাধ্যম ছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এই ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ সমস্যাটিও আর রহিল না, যাহা পবিত্র কুরআনের

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ–

{অর্থ ঃ নিশ্চয়, যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং উহার প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তাহাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হইবে না। পারা–৮, সূরা আরাফ, রুকু–৫, আয়াত–৪০}

এই আয়াত হইতে বুঝা যাইতেছে, কাফেরদের রূহ আসমানে যাইতে পারিবে না। তাহা হইলে কি করিয়া কাফেরদের রূহ আদমের বাম পাশে আসিয়াছিল?

{উত্তরে বলা হইল- রূহ আসে নাই, দরজা দিয়া শুধু রূহের প্রতিবিম্ব আসিয়াছিল। ইহাই রূহের ছবি। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, রূহ কিংবা উহার প্রতিবিম্ব বা ছবি ইত্যাদি কিছুই হযরত আদমের (আঃ) নিকটে আসে নাই, বরং এইগুলি আসমান হইতে বহু দূরে যেইখানে থাকার কথা সেইখানেই ছিল। আদম আলাইহিস্ সালামের বাম পাশের দরজা দিয়া তাকাইলে কাফেরদের সেই দূরবর্তী স্থানটি নজরে পড়িত এবং সেইখানকার রূহগুলি নজরে ভালভাবে আসিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।}

নীল ও ফোরাত

নীল এবং ফোরাত সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, সপ্তম আসমানের উপর সিদরাতুল মুন্‌তাহার গোড়ায় উহাদের উভয়কে দেখিয়াছেন। আসমানে এই নদীদ্বয় দেখার ব্যাপারে যে প্রশ্নটি উঠিতেছে, অর্থাৎ এইগুলি তো পৃথিবীর নদী, সেইখানে থাকিবার কি অর্থ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর সিদরাতুল মুন্তাহার বর্ণনায় দেওয়া হইবে। এইখানে শুধু দুই হাদীসের মধ্যকার বিরোধ দূর করিয়া উভয়ের বর্ণনায় সমতা ও সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে। ব্যাখ্যাটি এই হইবে যে, উভয় নদীর প্রকৃত মূল ও উৎস এবং ঝর্ণার প্রথম আরম্ভ হওয়ার স্থান সিদরাতুল মুন্তাহার গোড়া। তথা হইতে পানির স্রোত বাহির হইয়া দুনইয়ার আসমানে আসিয়া একত্রিত হয়। আবার এই আসমান হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসে। ইহার বর্ণনা পরে দেওয়া হইবে।

হাউজে কাউসার

উপরের ব্যাখ্যা দ্বারা কাউসার {দুনইয়ার আসমানে ও বেহেশতে} দেখা সম্বন্ধে যে দুইটি বর্ণনা রহিয়াছে, উহার সমাধানও করিয়া নিতে হইবে। অর্থাৎ শরীকের হাদীসে রহিয়াছে, কাউসার দুনইয়ার আসমানে, আবার অন্য হাদীসে পাওয়া যায়, কাউসার বেহেশতে। এমতাবস্থায় উত্তর এই হইতেছে যে, বেহেশতে উহার মূল উৎস আর দুনইয়ার আসমানে উহার এক শাখা। যেমন– উহার আর এক শাখা কিয়ামাতের ময়দানে হইবে। {১}

উপটীকা ঃ {১} إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ –

–নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করিয়াছি।– সূরা কাউসার*
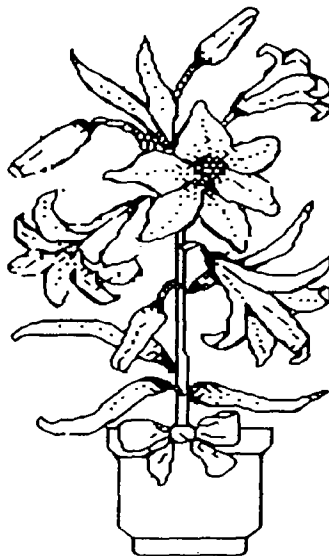
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় আসমানে বিশ্বনবী

বুখারীর হাদীসে বর্ণিত, {হুজুর বলেন,} অতঃপর জিবরাঈল আমাকে সামনে রাখিয়া আরোহণ করতঃ রওনা দিয়া দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত আসিয়া পৌছিলেন এবং দরজা খোলাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল কে? বলিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। পুনরায় প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার নিকট {নবুয়াতের বা মি'রাজের} ওহী আসিয়াছে কি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, হাঁ। ফেরেশতাগণ এই কথা শ্রবণ করতঃ "মারহাবা! ধন্যবাদ! আপনার আগমন অত্যধিক শুভ হইয়াছে, আপনি উত্তম আগমন হিসাবে তাশরীফ আনিয়াছেন" বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)

হুজুর ফরমান, আমি যখন দ্বিতীয় আসমানে পৌছিলাম, তখন সেইখানে হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা আলাইহিসসালামকে উপস্থিত পাইয়াছি। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর খালাতো {মাসী} ভাই ছিলেন। এই সময় জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলিলেন, ইনি ইয়াহইয়া এবং তিনি ইসা, আপনি তাঁহাদিগকে সালাম করুন। আমি তাঁহাদিগকে সালাম দিলাম, তাঁহারাও জওয়াব দিলেন এবং উত্তম ভাই ও মহান নবী বলিয়া মারহাবা দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মাতা ছিলেন হযরত মারইয়াম আলাইহাস্ সালামের খালা, এই হিসাবে ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহইয়ার খালাতো ভগ্নীর ছেলে- দৌহিত্র। কেননা অনেক সময় মাতামহকে মাতা হিসাবে ধরা হয়। এই জন্য ঈসা আলাইহিস্ সালামের

মাতামহকে তাঁহার মাতা হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। সত্যই যদি এই মাতামহ ঈসা আলাইহিস সালামের আসল মাতা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর প্রকৃত খালাতো {মাসী} ভাই হইতেন।

বস্তুতঃ এই কারণেই সাধারণ নিয়মে তাঁহারা প্রকৃত খালাতো ভাই না হইলেও মাজাজী- ধরিয়া নেওয়া হিসাবে তাঁহাদিগকে খালাতো ভাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালামের খালার সন্তানের মধ্যে একজন। যদিও ছেলে নয়, কিন্তু দৌহিত্র। ইহাই খালাতো ভাই বলার উদ্দেশ্য।

তাঁহারা দুই জনের কেহই হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাপ-দাদার বংশের ছিলেন না, এই জন্য তাঁহাদিগকে ভাই বলা হইয়াছে {তাঁহারা হুজুরকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন}।
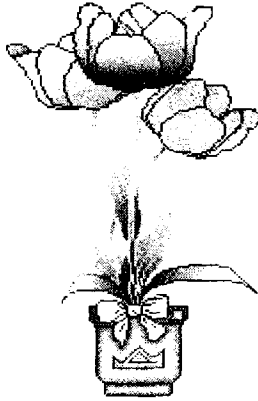
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় আসমানে নিশ্বনবী

বুখারীর হাদীসে বর্ণিত, হুজুর ফরমান, এর পর জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে? বলা হইল, জিবরাঈল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সহিত ইনি কে? জিবরাঈল বলিলেন, ইনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার নিকট {নবুয়াত বা মি'রাজের} ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি? জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন– হাঁ। এই কথা শুনিয়া মারহাবা! আপনি অনেক উত্তম শুভাগমনে তাশরীফ আনিয়াছেন বলিয়া ফেরেশতাগণ দরজা খুলিয়া দিলেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)

{হুজুর ফরমান,} আমি সেইখানে উপস্থিত হইলাম। তথায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম {পূর্ব হইতে} হাজির ছিলেন। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে বলিলেন, ইনি হযরত ইউসুফ, আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং উত্তম ভাই ও মহানবী বলিয়া মারহাবা দিলেন।

অন্য এক হাদীসে রহিয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, {ইউসুফের রূপ দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম, তাই} দেখিব আর কি! ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে সৌন্দর্যের এক (বিরাট) অংশ দান করা হইয়াছে {উহা দেখিতেছিলাম}। –মিশকাত মুসলিম

আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বাইহাকীর হাদীসে এবং আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিবরানীর হাদীসে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে হুজুরের ইরশাদ রহিয়াছে যে, এমন একজন সৌন্দর্যের মহাপুরুষকে দেখিয়াছি, যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন।

সৌন্দর্য ও রূপের তুলনায় তিনি সকল মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চন্দ্রের যেইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, মানুষের মাঝে সৌন্দর্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ এইখানে দুইটি বিষয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

{১} প্রথমটি হইতেছে- জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই অমুম বা সর্বসাধারণের সহিত জড়িত নহেন, তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছুকে এইখানে আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং তিনি ছাড়া অন্য সব মানুষকে হযরত ইউসুফের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

এই মতের দলীল হিসাবে তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আনাসের এই হাদীসটিকে পেশ করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা শারীরিক সৌন্দর্য ও সুন্দর স্বর দান না করিয়া কোন নবীকে প্রেরণ করেন নাই। আর তোমাদের নবী সকল নবী হইতে অত্যধিক সুন্দর ও অধিক উত্তম আওয়াজবিশিষ্ট ছিলেন।

{২} সম্ভাবনার দ্বিতীয় বিষয় এই হইতেছে যে, হাদীসের অমুম বা সর্বসাধারণের সহিত হুজুরকে শামিল করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেননা কোন আংশিক কল্যাণ সামগ্রিক কল্যাণের কোন ক্ষতি করে না, অর্থাৎ আংশিক গুণ দ্বারা সামগ্রিক গুণের ক্ষতি হয় না এবং মর্যাদা ও সম্মানের উর্ধ্বে উঠিতে পারে না।{অর্থাৎ ইউসুফ আলাইহিস সালাম আংশিক গুণ ও কল্যাণ পাইয়াছেন, আর হুজুর সমস্ত গুণ ও কল্যাণ পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন।}

অথবা এইখানে এই কথাও বলা যাইতে পারে সে, সৌন্দর্য বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। উহার মধ্য হইতে এক প্রকারের সৌন্দর্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সুন্দর ছিলেন। আর এক প্রকারের সৌন্দর্যের মধ্যে আমাদের আকায়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্বাধিক সুন্দরতম মানব ছিলেন।

আবার এই উভয় প্রকার সৌন্দর্যের মধ্যে ফাযীলাত ও মারতাবার দিক দিয়া পার্থক্য রহিয়াছে যে, ইউসুফী সৌন্দর্য বাহ্যিক ও প্রকাশ্যে সর্বাধিক স্পষ্ট ছিল এবং উহা সীমিতের মধ্যে গণ্য। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদী সৌন্দর্য অপ্রকাশ্য ছিল। আর গোপনীয় ও আড়ালের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও মহা দয়ালের চিহ্ন নিহিত ছিল।

যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হুজুরের দিকে তাকান হইত, তখন তাঁহার চেহারার মধ্যে এমন সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, মনে হইত তিনি যেন কত বড় মহা দাতা, কতই না স্নেহশীল। আর এই মুহাম্মাদী সৌন্দর্য অস্পষ্ট ও গোপনীয় এবং অসীম ও অনন্ত।

ইউসুফী সৌন্দর্যের উপাধি "হুসনে সাবাহাত" অর্থাৎ ফর্সা রং বা শোভা এবং মুহাম্মাদী সৌন্দর্যের সম্মানিত নাম "হুসনে মালাহাত" অর্থাৎ কোমলতা বা কমনীয়তা রাখিলে উভয় সৌন্দর্যের জন্য মনে হয় উত্তম হইবে।

নিম্নলিখিত কবিতাটি বোধহয় মুহাম্মাদী সৌন্দর্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে ঃ

يَزِيْدُكَ وَجْهَهٗ حُسْنًا اِذَا مَا زَادَتْهُ نَظَرٌ-

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْرِ وَالْمَحَلُّ مَحَلُّ اَدَبٍ-

অর্থ ঃ হে শ্রোতা! তুমি যত অধিক তাঁহার প্রতি তাকাইবে ততই তোমার জন্য তাঁহার মুখমন্ডলের সৌন্দর্য আরো বর্ধিত হইতে থাকিবে। এইরূপ কার্যের মূল রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন। ইহা আদব ও সম্মানের স্থান।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
চতুর্থ আসমানে বিশ্বনবী

বুখারীর মধ্যে রহিয়াছে যে, অবশেষে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে লইয়া চতুর্থ আসমানে পৌঁছিলেন এবং দরজা খোলাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কে? বলা হইল, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সহিত ইনি কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার প্রতি আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি? জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, হাঁ। ফেরেশতাগণ এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, মারহাবা! আপনি বড় উত্তম আগমনে তাশরীফ আনিয়াছেন, এরপর দরজা খুলিয়া দিলেন।

হযরত ইদরীস (আঃ)

–আমি তথায় পৌঁছিয়া হযরত ইদরীস আলাইহিস্ সালামকে উপস্থিত পাইলাম। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলিলেন, ইনি ইদরীস নবী, আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, উত্তম ভাই ও মহানবীর জন্য মারহাবা।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম হুজুরের পিতামহগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কেন হুজুরকে ছেলে সম্বোধন না করিয়া ভাই বলিয়াছিলেন, উহার কারণ এই হইতে পারে যে,

{ক} নবীগণ পরস্পর নবুয়াতী ভাই, সেই জন্য হয়ত ভাই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তবে ছেলে ও ভাই– এই দুইয়ের মধ্যে ছেলে হইতে ভাই

বলাই অধিক সম্মান ও আদবের কাজ। সুতরাং তিনি আদব রক্ষার্থে ছেলের পরিবর্তে ভাই বলাকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

{খ} অথবা এই ছেলে মর্যাদা ও সম্মানে পিতা হইতে বড়, তাই সম্মানিত ছেলেকে ভাই উপাধিতে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন।

{গ} ইবনুল মনীর বলিয়াছেন, অপ্রসিদ্ধ দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীসে 'মারহাবা বি-ইবনিচ্ছালেহ্'- উত্তম ছেলের প্রতি মারহাবা, এইভাবে লেখা রহিয়াছে।

{ঘ} আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই ইদরীস হযরত ইলইয়াস আলাইহিস সালামের উপাধি। তাঁহার সহিত হুজুরের সাক্ষাত হইয়াছিল। ইনি হুজুরের পিতামহ নবীগণের মধ্য হইতে ছিলেন না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।
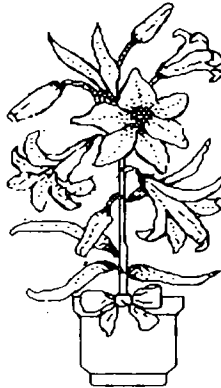
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম আসমানে বিশ্বনবী

বুখারীর মধ্যে আছে, অতঃপর আমাকে সামনে লইয়া জিবরাঈল পঞ্চম আসমানের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন আর দরজা খোলাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে? বলা হইল, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, সাথে ইনি কে? বলা হইল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার নিকট আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি? বলা হইল হাঁ। ফেরেশতাদের তরফ হইতে বলা হইল, আপনি মহা শুভাগমনে তাশরীফ আনিয়াছেন, মারহাবা।

হযরত হারূন (আঃ)

আমি যখন তথায় পৌঁছিয়াছিলাম, তখন সেখানে হযরত হারূন আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত ছিলেন। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, ইনি হারূন (আঃ), আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন আর বলিলেন, উত্তম ভাই এবং মহানবীর প্রতি মারহাবা।
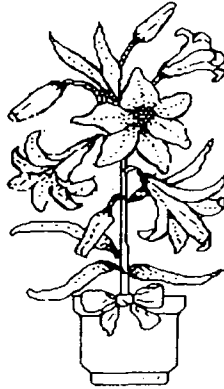
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ আসমানে বিশ্বনবী

বুখারীর মধ্যে আছে, অবশেষে আমাকে সামনে লইয়া জিবরাঈল ষষ্ঠ আসমানের নিকট পৌঁছিয়া দরজা খোলাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে? বলা হইল, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সহিত ইনি কে? বলা হইল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার নিকট আল্লাহর ওহী আসিয়াছে কি ? বলা হইল, হাঁ। ফেরেশতাগণ বলিলেন, আপনি অনেক উত্তমভাবে তাশরীফ আনিয়াছেন।

হযরত মূসা (আঃ)

আমি যে সময় সেইখানে গিয়াছিলাম, সেই সময় তথায় মূসা আলাইহিস সালাম উপস্থিত ছিলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, ইনি মূসা (আঃ), আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, উত্তম ভাই ও মহানবীর প্রতি মারহাবা।

আমি যখন সামনের দিকে অগ্রসর হইলাম, তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে মূসা (আঃ)! আপনার কাঁদিবার কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমার পরে এক নওজোয়ান পয়গাম্বর প্রেরিত হইয়াছেন, যাঁহার বেহেশ্তবাসী উম্মাত সংখ্যায় আমার বেহেশ্তবাসী উম্মাত হইতে অনেক বেশী হইবে। এই জন্য কাঁদিতেছি।

(কেননা আমার উম্মাতদের জন্য আফসুস হইতেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মাতেরা যেইভাবে তাঁহার অনুকরণ ও

অনুসরণ করিবে, আমার উম্মাতেরা সেইভাবে আমার অনুকরণ ও অনুসরণ করে নাই। এই কারণে আমার উম্মাতের এই ধরনের লোকেরা বেহেশত হইতে মাহরূম থাকিবে। তাহাদের ভয়াবহ অবস্থার প্রতি খেয়াল করিলে কান্না আসিয়া যায়।)

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে নওজোয়ান শব্দ ব্যবহার করা এই হিসাবে বৈধ হইয়াছে যে, হুজুরের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় সময় খুব কম ছিল, অর্থাৎ তিনি পুরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত হায়াত পান নাই। লোকেরা নবুয়াতের এই সামান্য সময়ের মধ্যে অধিক বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। উপরন্তু হুজুরের বয়স মাত্র ৬৩ বৎসর ছিল। আর মূসা আলাইহিস সালাম ১৫০ বৎসর হায়াত পাইয়াছিলেন।

–(কাসাসুল আম্বিয়া)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম আসমানে বিশ্বনবী

বুখারীর মধ্যে রহিয়াছে, অতঃপর আমাকে সামনে লইয়া জিবরাঈল সপ্তম আসমানের দিকে উঠিলেন এবং দরজা খোলাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে? বলা হইল, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সহিত ইনি কে? বলা হইল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার নিকট আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি? বলা হইল, হাঁ। ফেরেশতাগণ বলিলেন, মারহাবা– আপনি মহান শুভাগমনে তাশরীফ আনিয়াছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও বাইতুল মা'মুর

{হুজুর বলেন,} আমি সেখানে পৌঁছিয়া ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে উপস্থিত পাইয়াছি। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, ইনি আপনার সর্বাধিক সম্মানিত পিতামহ ইবরাহীম (আঃ), আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, উত্তম সন্তান ও মহানবীর প্রতি মারহাবা।

অন্য হাদীসে রহিয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় কোমর বাইতুল মা'মুরের সহিত লাগাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন। বাইতুল মা'মুরে প্রত্যহ ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া থাকে, যাহাদের ঢুকিবার পালা আর ফিরিয়া আসিবে না (অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রবেশ করার সুযোগ আর হয় না। প্রত্যহ নূতনভাবে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া থাকে–)। –মিশকাত–মুসলিম হইতে

বাইহাকীর দালায়েলের মধ্যে আবু সাঈদ হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন আমাকে সপ্তম আসমানে উঠান হইয়াছিল, তখন সেখানে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিক সুন্দর পুরুষ। তাঁহার নিকট তাঁহার সম্প্রদায়ের কিছু লোক এবং আমার উম্মাতেরা উপস্থিত ছিল। ইহারা দুই দলে বিভক্ত। এক দলের পরনে সাদা কাপড় আর এক দলের পরনে ময়লা কাপড় ছিল। আমি বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করিলে আমার সহিত সাদা পোশাকধারীরা প্রবেশ করিল। অন্যদেরকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। আমি এবং আমার সাথী প্রবেশকারীরা সহ সেখানে নামায পড়িলাম।

ব্যাখ্যা ঃ বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের ক্রমিক বর্ণনা অন্য ধরনের পাওয়া যায়। তবে উল্লিখিত বর্ণনা সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

বাইতুল মা'মুরের আরো কিছু বর্ণনা সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার পরে আসিবে। {অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে দেখুন!}
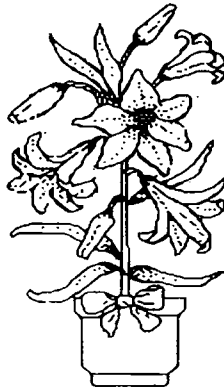
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সিদরাতুল মুন্তাহা

{ক} বুখারীতে রহিয়াছে, অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে উঠান হইয়াছে। উক্ত বৃক্ষের কুলগুলি হেজের নামীয় স্থানের মটকার মত এবং উহার পাতাগুলি হাতীর কানের ন্যায়। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, ইহা সিদরাতুল মুন্তাহা {শেষ সীমার কুল বৃক্ষ}।

নীল ও ফোরাত ঃ সেখানে চারিটি পানির নহর ছিল। দুইটি ভিতরের দিকে প্রবাহিত আর দুইটি বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরাঈল! এইগুলি কি? জিবরাঈল বলিলেন, যেই দুইটি নহর ভিতরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, ইহারা বেহেশতের নহর। আর যেই দুইটি বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, উহারা নীল ও ফোরাত।

দুগ্ধপাত্র ঃ এর পর আমার নিকট শরাব, দুধ ও মধুর তিনটি পাত্র আনা হইল, আমি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিলাম। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, ইহা ফিৎরাত (অর্থাৎ দ্বীন-ধর্ম), যাহার উপর আপনি ও আপনার উম্মাতগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

{খ} বুখারীর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, সিদরাতুল মুন্তাহার মূলের মধ্যে এই চারিটি নহরের অবস্থান।

{গ} মুসলিমে বর্ণিত আছে, উহার {সিদরাতুল মুন্তাহার) মূল হইতে এই চারিটি নহর প্রবাহিত হইতেছে।

{ঘ} **কাউসার ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে ইব্নে আবী হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সহিত সাক্ষাতের পর আমাকে সপ্তম আসমানের উচ্চ ছাদে লইয়া গেলেন। হুজুর এমন এক নহরের নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন, যাহার উপরে ইয়াকুত, মুক্তা ও যবরজদ পাথরের তৈয়ারী পেয়ালা রাখা ছিল এবং সেখানে সবুজ রংয়ের পাখীও ছিল। জিবরাঈল আলইহিস্ সালাম বলিলেন, ইহা কাউসার, যাহা আপনার প্রতিপালক

আপনাকে দান করিয়াছেন, উহার অভ্যন্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্য থালা সাজানো রহিয়াছে এবং উহা ইয়াকুত ও জমরুদ পাথরের তৈয়ারী জমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার পানি দুগ্ধ হইতেও অধিক সাদা। আমি এক পাত্র পানি লইয়া উহা হইতে কিছুটা পান করিলাম। উক্ত পানি মধু হইতে অধিক মিষ্টি এবং মৃগনাভী হইতে অধিক খুশবুদার- সুরভিত ছিল।

(ঙ) বাইহাকীর হাদীসে আবু সাঈদের (রাঃ) বর্ণনায় পাওয়া যায়- সেইখানে একটি কূপ ছিল, যাহার নাম (سَلْسَبِيْل) সালসাবীল। উহা হইতে দুইটি নহর বাহির হইতেছিল। একটির নাম কাউসার অপরটির নাম নহরে রাহমাত-রাহমাতের নালা।

সিদরাতুল মুন্তাহা

{চ} মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহা পৌছান হয়। উক্ত সিদরাতুল মুন্তাহা ষষ্ঠ আসমানে। পৃথিবী হইতে যত আমাল- মানুষের কৃতকর্ম উপরে উঠিয়া আসে, সবগুলি এই পর্যন্ত আসিয়া পৌছে। তারপর এখান হইতে উপরে লইয়া যাওয়া হয়। আর যত আহকাম- আদেশ ও নিষেধাবলী উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে, সেইগুলিও (প্রথমে) এইখানেই অবতীর্ণ হয়। তারপর এইখান হইতে নীচে (আলমে দুনইয়ার মধ্যে) লইয়া আসা হয় (এই জন্যই উহার নাম সিদরাতুল মুন্তাহা- শেষ সীমার কুল বৃক্ষ কিংবা দুই সীমানার চিহ্নিত শেষ স্থানের কুল বৃক্ষ রাখা হইয়াছে)।

{ছ} বুখারীতে বর্ণিত আছে, এমন ধরনের রং ও বর্ণ সিদরাতুল মুন্তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই রং কি জিনিস ছিল জানা যায় নাই।

{জ} মুসলিমে রহিয়াছে, ঐগুলি স্বর্ণের প্রজাপতি ছিল।

{ঝ} অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, সেইগুলি স্বর্ণের পঙ্গপাল।

{ঞ} আর এক হাদীসে বর্ণিত, ফেরেশতারা উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

{ট} মুসলিমের এক হাদীসে বর্ণিত, সেই সময় এক আশ্চর্য বস্তু আল্লাহর হুকুমে উহাকে ঢাকিয়া ফেলিল, তখন উহার আকৃতি পরিবর্তন হইয়া এমন রূপ ধারণ করিয়াছিল, যাহার গুণাগুণ বর্ণনা করা কোন সৃষ্টির সাধ্য ছিল না।

{ঠ} আর এক হাদীসে বর্ণিত, সিদরাতুল মুন্তাহা দর্শন করা এবং পানপাত্রসমূহ পেশ করার মধ্যখানে পুনরায় আমার সম্মুখে বাইতুল মা'মুর উত্তোলন করিয়া দেখান হইয়াছিল। –মুসলিমে অনুরূপ

{ড} এক বর্ণনায় রহিয়াছে, সিদরাতুল মুন্তাহা দেখিবার পর যাহা আমাকে দেখান হইয়াছিল, তাহা এই হইতেছে যে, পুনরায় আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়। বেহেশতের গম্বুজ মণি–মুক্তার এবং মাটি মেশকের। –মিশকাত– বুখারী ও মুসলিম হইতে

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ্যভাবে হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সিদরাতুল মুন্তাহা সপ্তম আসমানের উপরে। তবে ষষ্ঠ আসমানে থাকা সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ ইহাও হইতে পারে যে, উহার আসল মূল ষষ্ঠ আসমানে। {১} এই ব্যাখ্যা দ্বারা বর্ণিত নহর চারিটি ষষ্ঠ আসমানে হওয়া জরুরী হইয়া পড়ে না। যেমন– হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, নহরগুলি সিদরাতুল মুন্তাহার মূল হইতে বাহির হইয়াছে। কেননা আসল কথা

উপটীকা ঃ {১} হয়ত ষষ্ঠ আসমানে উহার শিকড়ের মূল ও প্রান্ত সীমা রহিয়াছে, আর এই ষষ্ঠ আসমান হইতে শুরু হইয়া সপ্তম আসমান ভেদ করতঃ উপরে যাইয়া বৃক্ষ হিসাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। শিকড়ের গোড়া বা শেষ সীমা ষষ্ঠ আসমানে এবং কান্ডের গোড়া সপ্তম আসমানে, এই ব্যাখ্যা দ্বারা সকল কিছুর সমাধান হইয়া গেল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। **[উপটীকা শেষ]**

হইতেছে, বৃক্ষটি ৬ষ্ঠ আসমান পার হইয়া {১} এবং ৭ম আসমান ভেদ করিয়া উপরের দিকে উঠিয়াছে, উহা ৭ম আসমান ভেদ করিয়া উপরে উঠিবার {৭ম আসমানের} এই স্থানকে উহার মূল হিসাবে ধরা হইয়াছে। নহরগুলি এই দ্বিতীয় মূল হইতে বাহির হইয়াছে।

কাউসারের ব্যাখ্যা

কাউসার ও নহরে রাহমাত নামে যে দুইটি নহর অভ্যন্তরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, মনে হয় উহারা উভয়ে সালসাবীলের শাখা। সম্ভবতঃ এই সালসাবীল এবং উহার যেই স্থান হইতে কাউসার ও নহরে রাহমাত শাখা হিসাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, উহারা সবই সিদরাতুল মুন্তাহার দ্বিতীয় মূল হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

ইব্নে আবী হাতেমের উপরোল্লিখিত বর্ণনায় প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায়, কাউসার বেহেশতের বাহিরে। অথচ অন্যান্য হাদীসে রহিয়াছে, বেহেশতের ভিতরে। ইহার সমাধান এই হইবে যে, সিদরাতুল মুন্তাহার মূলে কাউসারের যে অংশ রহিয়াছে উহা বাহিরের অংশ, আর অবশিষ্ট অধিকাংশ বেহেশতের ভিতরে।

নীল ও ফোরাতের ব্যাখ্যা

নীল ও ফোরাত নদীদ্বয় আসমানে থাকিবার সম্ভাবনা বোধহয় এইভাবে হইতে পারে যে, সাধারণতঃ নদীর জন্ম হয় পাহাড় হইতে এবং পাহাড়ের

উপটীকা ঃ {১} অর্থাৎ ষষ্ঠ আসমানে উহার জন্ম।

পানি আসে বৃষ্টি হইতে। আর বৃষ্টি অবতীর্ণ হয় আকাশ {বা মেঘ} হইতে।{১}

সুতরাং এই নিয়ম্‌ অনুযায়ী বৃষ্টির যে অংশ নীল ও ফোরাতের জন্য নির্ধারিত {যাহা পাহাড় বা উক্ত নদীদ্বয়ের দুই তীরে পতিত হইয়া তারপর স্রোত আকারে উহাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে, কিংবা মেঘ হইতে যেই বৃষ্টি সোজা বরাবর উহাদের মধ্যে পতিত হয়}, উহা এই সিদরাতুল মুন্তাহার গোড়া হইতে আসিয়া থাকে। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা নীল ও ফোরাতের আসল মূল আসমানে থাকা সাব্যস্ত হইয়া গেল।{২} অর্থাৎ অন্যান্য নদ-নদী যেই নিয়মে এবং যেই পানি দ্বারা জন্ম হইয়াছে, নীল ও ফোরাত সেই নিয়মে সৃষ্টি হয় নাই। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

উপটীকা ঃ {১} অর্থাৎ নদী-নালা উৎপন্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতির একটি সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে। যথা– নদীর পানি আসে পাহাড় বা অন্য উচ্চস্থান হইতে, পাহাড়ে পানি আসে বৃষ্টি হইতে, বৃষ্টি মেঘ হইতে, মেঘ বাষ্প হইতে, আর বাষ্প সাগর ও মহাসাগর হইতে সূর্যের উত্তাপে সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু নীল ও ফোরাত নদীর পানি হুবহু এই নিয়মে আসে না। অর্থাৎ উহাদের আসল ও বারকাতের পানি সাগর এবং মহাসাগরের বাষ্প নহে। বরং উহাদের সম্পূর্ণ অথবা কিছু পানি কিংবা পানির মৌলিক উপাদান বা মূল উৎস এই সিদরাতুল মুন্তাহা হইতে আসিয়া থাকে। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ।

{২} যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, নীল ও ফোরাত নদীদ্বয়ের আসল মূল সিদরাতুল মুন্তাহায় কেন হইল এবং অন্যান্য সকল নদ-নদী আর সাগর ও মহাসাগরের আসল মূল সেখানে হইল না কেন? তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর ইন্‌শাআল্লাহ আমি চারি প্রকারে দিব। ইহার আগে একটি কথা বুঝিয়া লউন। আল্লাহ তাআলার হিকমাত একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন, আর কেহ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকাঃ

নহে। তবে বান্দাকে যতটুকু তিনি জানিতে দেন, বান্দা তাহাই জানে, তাহার বেশী নহে। কিন্তু বান্দা কতটুকু জানিতে পারিল ইহা জানা যায় না। অতএব বান্দা যাহা বলিবে তাহাই একেবারে ঠিক ঠিক হইবে, এমনও নহে।

নীল ও ফোরাত নদী আকাশে থাকার প্রথম উত্তর ঃ

{ক} উক্ত নহর দুইটি দুনইয়ার নীল ও ফোরাত নহে। উহাদের সহিত পৃথিবীর নীল ও ফোরাতের কোন সম্পর্ক নাই। শুধু সেখানকার দুইটি নহরের নাম নীল ও ফোরাত রাখা হইয়াছে, এতটুকু মাত্র। যেমন– পৃথিবীতে একই নামে একাধিক মানুষ রহিয়াছে এবং একাধিক স্থানের নাম এক নামে চলিতেছে। অথচ ইহাদের মধ্যে কাহারো সহিত কাহারো কোন সম্পর্ক নাই। ঠিক তেমনি এক নামে দুই নদী হইতে পারে। কোন সম্পর্কের প্রয়োজন রাখে না। আর তাহা ছাড়া এখানে তো এক নামের দুইটি নদী হইলেও একটি আসমানে আর একটি পৃথিবীতে। অতএব সেখানকার নদী পৃথক, আর এখানকার নদী পৃথক। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

{খ} নহর দুইটি পৃথিবীর নীল ও ফোরাত না হইলেও পৃথিবীর নীল ও ফোরাতের সঙ্গে পানির আকৃতি ও স্রোতসহ বিভিন্নভাবে সম্পর্ক রাখে। একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টি বুঝিতে অধিক সহায়ক হইবে। উদাহরণটি হইতেছে এই-

হযরত আবু বকরের (রাঃ) আকৃতি ও গলার আওয়াজ দিয়া আল্লাহ্ তাআলা হুজুরের উদ্দেশে একজন ফেরেশতা বানাইয়াছিলেন। যাহার বর্ণনা এই কিতাবের বিংশ পরিচ্ছেদে পাইবেন।

হযরত আবু বকর নিজ স্থানে দুনইয়াতেই রহিয়াছেন। তিনি তখন কিছুই জানেন না। অথচ অপর দিকে সপ্তম আকাশের উপরে ৭০ হাজার নূরের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

পর্দার পর মহা নির্জন স্থানে তাঁহার আকৃতির জন্ম হইয়া তাঁহারই আওয়াজে কথা বলিতেছেন এক ফেরেশতা। এদিকে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ফেরেশতার সহিত আবু বকরের কোন সম্পর্ক নাই। আবার অন্য দিকে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, আকৃতি ও গলার আওয়াজে আবু বকরের সহিত সম্পর্ক আছে।

মনে হয়, আকাশের নীল ও ফোরাতের সহিত দুনইয়ার নীল ও ফোরাতের সম্পর্ক থাকা না থাকার ব্যাপারটা এই ঘটনার অনুরূপ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

নীল ও ফোরাত নদী আকাশে থাকার দ্বিতীয় উত্তর ঃ

{ক} উল্লিখিত এই নদীদ্বয়ের সহিত ইসলামের অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত। ইসলামের ইতিহাসকে জানিতে হইলে এই নদী দুইটিকে জানিতে হইবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের লাঠির আঘাতে এই নীল নদীতে রাস্তা হইয়া গিয়াছিল। {অবশ্য মূসার নদী সম্বন্ধে অন্য বর্ণনাও আছে।} তিনি ও তাঁহার সাথী উম্মাতেরা এই রাস্তা দিয়া নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন। আর এই নদীতেই মরিয়া গিয়াছিল ফিরআউন ও তাহার দল।

ফোরাত নদীর তীরে কারবালা অবস্থিত। এইখানেই নবী বংশের করুণ ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। ইহারই পানি পান করার কিসমত তাঁহাদের হয় নাই। এরই পানির সহিত সেই দিন মিশিয়া গিয়াছিল, তীরের আঘাতে নির্গত হওয়া প্রিয় নূর নবীর রক্তের রক্ত, কলিজার টুকরা, নয়নমণি, প্রিয় দুলাল হযরত হুসাইনের (রাঃ) পবিত্র মুখের পবিত্র রক্ত।

{খ} বড় বড় অগণিত পয়গাম্বর আলাইহিমুস্ সালামগণ প্রায় এই দুই নদীর পাড়েই বসবাস করিতেন। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

{গ} বিশ্ব সভ্যতার প্রথম আদি ভূমি এই দুই নদীর অববাহিকা। ইহাদের আশপাশ দিয়া পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সভ্যতার গোড়া নীল ও ফোরাত। আর নীল ও ফোরাতের গোড়া সিদরাতুল মুন্তাহা। সোবহানাল্লাহ।

{ঘ} হয়ত এই নদীদ্বয় পৃথিবী সৃষ্টির একেবারে সর্বপ্রথম নদী। উহাদের পূর্বে আর কোন নদী সৃষ্টি হয় নাই।

মনে হয়, সিদরাতুল মুন্তাহায় উক্ত নদীদ্বয়ের গোড়া থাকার কারণে উহারা এত সম্মানিত এবং ঐতিহাসিক বিখ্যাত নদী হিসাবে গণ্য হইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

নীল ও ফোরাত নদী আকাশে থাকার তৃতীয় উত্তর ঃ

শুধু এই দুইটি নদীর মূল গোড়া সিদরাতুল মুন্তাহা নহে, বরং সকল নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরের আসল গোড়া সেইখানে। তথা হইতে সমস্ত নদ-নদীর বারকাতের এবং পৃথিবীর জীবনী শক্তির পানি আসিয়া থাকে। তবে হুজুরকে মাত্র দুইটির স্রোতধারা দেখান হইয়াছে, যে দুইটি হুজুরের জন্য দরকার ছিল এবং যেইগুলি হুজুরের পরিচিত। অথবা সব নদী দেখিয়া থাকিবেন, তবে হয়ত বর্ণনা মাত্র দুইটিরই করিয়াছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

বর্ষাকালে অধিক পানি হওয়ার বর্ণনা

যদি ব্যাখ্যা উপরোল্লিখিত তৃতীয় উত্তরের ইহাই হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা আর একটি প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। অর্থাৎ বর্ষাকালে পুকুর, খাল, বিল, মাঠ, ঘাট, নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগর তথা পৃথিবীর প্রায় সকল নীচু স্থান পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এমনকি মাঝে মাঝে বন্যায় বিভিন্ন দেশের বহু অঞ্চল ডুবাইয়া মহাক্ষতি করিয়া থাকে। তখন আকাশেও পুরাপুরি মেঘ দেখা যায় এবং অনবরত বৃষ্টিও হইতে থাকে। **[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]**

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

অথচ শীত ও বসন্তসহ অন্যান্য কয়েকটি ঋতুকালে খাল শুকাইয়া যায় এবং মাঠগুলি শুকাইয়া রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতে থাকে। এমনকি কতিপয় নদ-নদী শুকাইয়া যায় এবং সাধারণতঃ সকল নদ-নদীর পানি অপেক্ষাকৃত অনেক নীচে নামিয়া আসে। সাগর–মহাসাগরের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। এদিকে আকাশেও মেঘ দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন হইল– বর্ষাকালে এইরূপ অতিরিক্ত পানি কোথা হইতে আসে?

উত্তর ঃ সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা হইতে আসে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্‌র রাহমাতে আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যার সপক্ষে পবিত্র আল-কুরআনে বহু দলীল রহিয়াছে। পরবর্তী বর্ণনা দ্বারাই আপনারা উহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

বাষ্প বা মেঘের অবস্থান সম্বন্ধে কুরআন আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছে যে, মেঘ আসমান ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে। উহা আসমানে উঠিতে পারে না এবং সোজাভাবে পৃথিবীতেও নামিয়া আসিতে পারে না, শুধু এই দুইয়ের মাঝেই অবস্থান করিতেছে।

ইরশাদ হইতেছে–

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ-

অর্থাৎ মেঘের মধ্যেও জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্‌র একত্বের নিদর্শন রহিয়াছে, যাহা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে।

– পারা ২, সূরা বাকারা, রুকু–২০, আয়াত–১৬৪

অথচ পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ ও পানি অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বেশীর ভাগে আরেক ধরনের আয়াতে কারীমা দেখা যাইতেছে। সেই সমস্ত স্থানে সরাসরি মেঘের উল্লেখ না হইয়া আসমানের উল্লেখ হইয়াছে এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ
বৃষ্টির উল্লেখ না হইয়া পানি ও জীবিকার উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য দুই এক স্থানে মেঘ বৃষ্টির উল্লেখও আছে।

নিম্নে নমুনাস্বরূপ পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত দেওয়া গেল। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ-

অর্থাৎ আর আমি আসমান হইতে বারকাতময় পানি বর্ষণ করিয়াছি। অতঃপর আমি উহা দ্বারা বাগান ও কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন করিয়াছি।

–পারা–২৬, সূরা কাফ, রুকু ১, আয়াত–৯

বিঃ দ্রঃ– কুরআন পাকের "মাআন মুবারাকান" অর্থাৎ মুবারাক পানি– তাফসীরকারগণ এই মুবারাক শব্দের বিভিন্ন অর্থ লিখিয়াছেন। কেহ বা বারকাত বা প্রাচুর্যের পানি, আবার কেহ বা উপকারের বা উপকারী পানি লিখিয়াছেন। যেমন– বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীরে মুবারাক পানির অর্থ বারকাতময় পানি না লিখিয়া 'উপকারী' পানি লিখিয়াছেন।

–তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২২, বৈরুতে মুদ্রিত, ১৯৬৯ ইং।

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

অর্থাৎ, আর পানিতে {আল্লাহর একত্বের নিদর্শন রহিয়াছে।} যাহা আল্লাহ্ তাআলা আসমান হইতে অবতীর্ণ করিতেছেন, অতঃপর উহা দ্বারা মৃত যমীনকে সুজলা, সুফলা করিয়াছেন।

– পারা ২, সূরা বাকারা, রুকু–২০, আয়াত–১৬৪,

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

–আল্লাহ তাআলা আসমান হইতে জীবিকা {বৃষ্টি} অবতীর্ণ করেন, পরে তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর {উদ্ভিদহীন হওয়ার} পর জীবিত করেন। উহাতে আল্লাহর নিদর্শন আছে।

– পারা–২৫, সূরা জাছিয়া, রুকু ১, আয়াত–৫,

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

–আল্লাহ্ তাআলা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন। অতঃপর উহা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল ফুল উৎপন্ন করিয়াছেন।

– পারা–১৩, সূরা ইবরাহীম, রুকু–৫, আয়াত–৩২

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

–তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্ তাআলা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন। –পারা–২৩, সূরা যুমার, রুকু–২, আয়াত–২১

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পুর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

—এবং আল্লাহ্ তাআলাই আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন।

পারা-২১, রুম, রুকু-৩'আয়াত-২৪

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

—আল্লাহ তাআলা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন।

– পারা-৭, সূরা আনআম, রুকু-১২, আয়াত-৯৯

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ،

—আপনি ভূতলকে বিশুষ্ক অবলোকন করিতেছেন, অনন্তর যখন আমি উহার উপর পানি বর্ষণ করি তখন উহা সরস ও স্ফীত হয় এবং নানাবিধ সুদর্শন তরুলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

—পারা-১৭, সূরা হজ্জ, রুকু-১, আয়াত-৫

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً
وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

—তিনি এমন সত্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে শয্যা ও আসমানকে ছাদ স্বরূপ বানাইয়াছেন। আর আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন।

—পারা-১, সূরা বাকারা, রুকু ৩, আয়াত-২২

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

–আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন স্রষ্টা আছেন কি? যিনি আসমান ও পৃথিবী হইতে তোমাদিগকে জীবিকা দিয়া থাকেন?

– পারা–২২, সূরা ফাতের, রুকু–১, আয়াত–৩

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাগণ! খুব ভালভাবে লক্ষ্য করুন। আসমানের আরবী سَمَاءٌ এবং মেঘের আরবী سَحَابٌ আর পানির আরবী مَاءٌ এবং বৃষ্টির আরবী مَطَرٌ

অবশ্য মেঘ ও বৃষ্টির আরো অন্য আরবীও আছে। যেমন– মেঘের আরবী مُزْنٌ এবং বৃষ্টির আরবী وَدْقٌ যাহার উদাহরণ একটু পরেই পাইবেন।

জানিয়া রাখুন যে, মুফাস্সেরীনগণ "সামা"র অর্থ আসমান ছাড়াও মেঘ এবং যাহা উপরে আছে ও ঘরের ছাদের উপর প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাফসীরে খাজেন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭, মিসরে মুদ্রিত, ১৯৫৫ ইং; তাফসীরে মুয়ালিমুত্তাঞ্জিল, খাজেনের উপরোক্ত পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

তাফসীরে জালালাইন– উর্দু শরাহ্ কামালাইন, ১ম পারা, পৃষ্ঠা ৩১, ৩২ লোগাতুল কুরআনে আছে, "সামা"–র অর্থ আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি। ঐ লোগাতে আরো লিখিত আছে যে, ইমাম রাগেব মুফরাদাতের মধ্যে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসের উপরকে "সামা" বলে।

–লোগাতুল কুরআন, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ সাহেব নোমানী। রফীক, নাদওয়াতুল মুছান্নেফীন।

উপরের আয়াতসমূহের মধ্যে আপনারাই দেখিতে পাইয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা মেঘের স্থলে আসমান এবং বৃষ্টির স্থলে পানি ও জীবিকা শব্দ ব্যবহার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে অনেক মহান হিকমাত নিহিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে এক হিকমাত ইহাও হইতে পারে যে, বারকাতের পানি, রাহমাতের পানি, জীবিকা ও জীবন ধারণের পানি এবং পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করার ও উদ্ভিদ উদগত হওয়ার পানি আসমান অর্থাৎ সিদরাতুল মুন্তাহা হইতে আসে, পরে বৃষ্টির সহিত মিশিয়া মাটিতে পড়ে। তাহা ছাড়া অন্যান্য পানি সাধারণভাবে মেঘ হইতে বৃষ্টির মাধ্যমে হইয়া থাকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লার ফজলে আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে হাদীস শরীফের মধ্যেও প্রমাণ রহিয়াছে। যথা–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اِنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ بَحْرًا يُنَزِّلُ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْحَيْوَانَاتِ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَيُمْطِرُ مَا شَآءَ مِنْ سَمَآءٍ اِلٰى سَمَآءٍ حَتّٰى يَنْتَهِىْ اِلٰى سَمَآءِ الدُّنْيَا وَيُوْحٰى اِلَى السَّحَابِ اَنْ غَرْبِلْهُ فَيُغَرْبِلُهُ فَلَيْسَ مِنْ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ اِلَّا وَمَعَهَا مَلَكٌ يَضَعُهَا مَوْضِعَهَا وَلَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ قَطْرَةً اِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَّا مَاكَانَ مِنْ يَوْمِ الطُّوْفَانِ مِنْ مَّاءٍ فَاِنَّهُ نَزَّلَ بِلَاكَيْلٍ وَلَاوَزْنٍ كَذَا فِىْ تَفْسِيْرِ التَّيْسِرِ–

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

–হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আরশের নীচে একটি সমুদ্র রহিয়াছে, ইহা হইতে প্রাণীদের উপজীবিকা অবতীর্ণ হইয়া থাকে। উক্ত সমুদ্রের প্রতি পানি বর্ষণের ওহী প্রেরণ করা হইলে উহা আদেশ মোতাবেক পানি বর্ষণ করিয়া থাকে। আর এই পানি এক আসমান হইতে অন্য আসমানের দিকে বর্ষিত হইয়া দুনইয়ার আসমান পর্যন্ত আসিয়া পৌছে।

এরপর উক্ত পানিকে বৃষ্টির আকারে বর্ষণ করার জন্য মেঘের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়, তখন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকে। প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার সহিত একজন ফেরেশতা রহিয়াছে, যিনি এই বৃষ্টির ফোঁটাটিকে উহার বর্ষিত স্থানে পৌছাইয়া থাকেন।

প্রত্যেক বৃষ্টি ফোঁটার পরিমাণ ও পরিমাপ জানা রহিয়াছে। কোন বৃষ্টির ফোঁটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপের অবগতি ব্যতীত অবতীর্ণ হয় না। তবে হাঁ, মহাপ্লাবনের সময় {অর্থাৎ নূহ নবীর (আঃ) যুগে} কি পরিমাণ পানি দেওয়া হইয়াছিল, উহার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ ছিল না।

– তাফসীরুত্তাইসীরে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯, ৭০।

কুরআন পাকে মেঘ এবং বৃষ্টিরও উল্লেখ আছে, এমন ধরনের তিনটি আয়াতে কারীমা উদাহরণ হিসাবে পেশ করিতেছি–

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَیَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ–

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

–মহান আল্লাহ এমন, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, এর পর উক্ত বায়ু মেঘমালাকে উত্তোলিত করে, অতঃপর তিনি উহাকে {একত্রিতভাবে} আকাশে ছড়াইয়া দেন, যেইভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, আর {কোন কোন সময়} তিনি উহাকে খন্ড খন্ড করিয়া (ছড়াইয়া) দেন। তৎপর দেখিতেছ, উহার {একত্রিত অথবা খন্ড খন্ড মেঘের} ভিতর হইতে বৃষ্টি বাহির হইতেছে। অতঃপর যখন তিনি নিজ দাসগণের মধ্য হইতে যাহার প্রতি ইচ্ছা উহা পৌছাইয়া দেন, তখন তাহারা খুশী হইয়া যায়।

–পারা–২১, সূরা রূম, আয়াত–৪৮

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ–

–তোমরা কি পানির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ? যেই পানি তোমরা পান করিয়া থাক, তাহা কি তোমরা মেঘ হইতে অবতরণ কর নাকি আমি অবতারণকারী?

– পারা–২৭, সূরা ওয়াকিয়াহ্, আয়াত–৬৮, ৬৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ–

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

–তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ তাআলা (শূন্যের মধ্যে কেমন করিয়া) মেঘমালা পরিচালিত করেন। তৎপর তিনিই সেই মেঘকে পরস্পর একত্রিত করিয়া দেন। অতঃপর ঐসকল মেঘমালাকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেন। অনন্তর তুমি অবলোকন করিতেছ যে, সেই মেঘের অভ্যন্তর হইতে বৃষ্টিধারা বহির্গত হইতেছে। আর তিনিই সেই মেঘ অর্থাৎ উহার বৃহৎ বৃহৎ খন্ডগুলি হইতে শিলা বর্ষণ করিয়া থাকেন। অতঃপর তিনি উহাকে যাহার প্রতি ইচ্ছা নিক্ষেপ করেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা দূরে সরাইয়া রাখেন।

–পারা–১৮, সূরা নূর, আয়াত–৪৩

নীল ও ফোরাত নদী আকাশে থাকার চতুর্থ উত্তর ঃ

স্বয়ং সিদরাতুল মুন্তাহা নামে যে বৃক্ষটি আসমানে রহিয়াছে, উহার ফুল, ফল ও পাতা দুনইয়ার কুল বৃক্ষের ন্যায় নহে। আর উহার ফল মানুষে খায় বা খাইবে, তাহারও প্রমাণ নাই। সুতরাং পরিষ্কার হইয়া গেল যে, উহা এক প্রকারের কুল বৃক্ষ, উহার কার্যকারিতা পৃথক ধরনের। আর পৃথিবীর কুল বৃক্ষ আর এক প্রকারের এবং ইহার উদ্দেশ্যও ভিন্ন।

অনুরূপভাবে আসমান ও পৃথিবীর কুল বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপ পার্থক্য আসমানের নীল ও ফোরাত এবং দুনইয়ার নীল ও ফোরাত নদী চতুষ্টয়ের মধ্যেও থাকিবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

[উপটীকা শেষ]

সিদরাতুল মুন্তাহার রং সম্পর্কে প্রজাপতি ও পঙ্গপালের নাম লওয়া শুধু উপমা ও দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহারা ফেরেশ্‌তা ছিল।

"উহা কি ছিল জানা যায় নাই"–হুজুরের এই কথা বলার তাৎপর্য এই হইতে পারে যে, {ক} প্রথম অবস্থায় জানা যায় নাই। {খ} অথবা আশ্চর্য হিসাবে বলিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত সিদরাতুল মুন্তাহার সৌন্দর্য এতই চমৎকার ছিল যে, সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করার কোন পদ্ধতি জানা ছিল না।

বাইতুল মা'মুরের বর্ণনা

{বাইতুল মা'মুরের কিছু বর্ণনা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে চলিয়া গিয়াছে।}

বাইতুল মা'মুর সম্বন্ধে মুসলিমের বর্ণনা হইতে জানা যায়, উহা সিদরাতুল মুন্তাহা হইতেও উপরে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে–

ثُمَّ رُفِعَ اِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ

অর্থাৎ সিদরাতুল মুন্তাহা দেখার পর বাইতুল মা'মুর আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ثُم শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে যে, উহাকে তুলিয়া ধরার কাজ সিদরাতুল মুন্তাহার পরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ সিদরাতুল মুন্তাহার স্থান ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম হইতে উপরে। তাহার দলীল হাদীসের আর একটি বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। যথা–

ثُمَّ رُفِعْتُ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

অর্থাৎ "ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালামের সহিত সাক্ষাতের পর সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে আমাকে উঠান হইয়াছে।" এখানেও ثُمَّ শব্দ রহিয়াছে, যাহার অর্থ অতঃপর বা পরে। এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপরের দিকে অর্থাৎ সিদরাতুল মুন্তাহায় যাওয়ার কার্য ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালামকে দেখার পর হইয়াছিল। তাহা হইলে "হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম

কোমরকে বাইতুল মা'মুরের সহিত ঠেস লাগাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন"–এই বাক্য কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইবে? কোমর ঠেস লাগান সম্পর্কে ১৭ নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর ঃ বাইতুল মা'মুরের ভিত্তি সপ্তম আসমানে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এখানেই উহার নীচের প্রাচীরের সহিত কোমর ঠেস লাগাইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু উক্ত বাইতুল মা'মুরের উচ্চতা সবার উপরে এতই মহা উচ্চ ছিল যে, উহার উপরের সর্বোচ্চ সীমা সিদরাতুল মুন্তাহা ছাড়িয়া আরো উপরে চলিয়া গিয়াছিল।

১৭ নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, "হুজুর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সাথীদেরকে লইয়া নামায পড়িয়াছিলেন।"

এই নামায পড়া দ্বারা হাদীসের কোন ইশকাল বা অসুবিধা সৃষ্টি হয় নাই। কেননা সম্ভবতঃ এই নামায নীচের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া পড়িয়াছেন। যেমন– অধিকাংশ মসজিদে এই ধরনেই নীচের দরজা দিয়া ঢুকিয়া নামায পড়া হয়।

হযরত কাতাদা (রাঃ) হইতে তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বাইতুল মা'মুর আসমানের মধ্যে একটি মাসজিদ। ইহা কা'বা ঘরের একেবারে সোজা উপরে অবস্থিত। অবশ্য কখনও পতিত হইবে না। তবুও যদি ধরিয়া লওয়া হয়, উহা যদি কখনও নীচের দিকে পড়ে, তাহা হইলে কাবা ঘরের ঠিক উপরে আসিয়া পড়িবে। দৈনিক উহাতে ৭০ হাজার ফেরেশ্তা প্রবেশ করে। তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলে পুনরায় ঢুকিবার পালা তাঁহাদের ভাগ্যে আর ফিরিয়া আসে না।

{ক} বেহেশ্তে প্রবেশ সম্বন্ধে উপরে যে কথা রহিয়াছে, উহা বাইতুল মা'মুরের দর্শনের পূর্বেও হইতে পারে আবার পরেও হইতে পারে। বেহেশ্ত

সম্পর্কে কুরআন মাজীদ হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, উহা সিদরাতুল মুন্তাহার নিকট। ইহাতে বেহেশ্‌ত বাইতুল মা'মুরের উপরেও হইতে পারে আবার নীচেও হইতে পারে। এইখানে উভয় সম্ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে।

{খ} আর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, বেহেশ্‌ত যদিও সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে, কিন্তু উহা হইতে আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে গিয়াছে।

{গ} যেইরূপভাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরী {রাঃ) হইতে বাইহাকী বর্ণনা করিয়াছেন, সিদরাতুল মুন্তাহা ভ্রমণের পর

ثُمَّ رُفِعْتُ اِلَى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ সিদরাতুল মুন্তাহা দেখার পর আমাকে বেহেশ্‌তের দিকে উঠান হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

বাইহাকীর উল্লিখিত হাদীসে এই কথাও আছে, বেহেশ্‌তের ভ্রমণ শেষ করার পর আমার সামনে দোযখ আনা হইল। উহার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি, শাস্তি ও প্রতিশোধ ছিল। যদি উহার মধ্যে পাথর এবং লৌহও ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে খাইয়া ফেলিবে {অর্থাৎ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিবে}। অতঃপর উহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

হাদীসের শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, দোযখ নিজ স্থানে ছিল আর হুজুর (সঃ) স্বীয় জায়গায় ছিলেন। মধ্যখানে পর্দা উঠাইয়া হুজুরকে দেখান হইয়াছে মাত্র।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

৫০ ওয়াক্ত নামায

বুখারীতে বাইতুল মা'মুর এবং দুগ্ধপাত্রসহ অন্যান্য পাত্র পেশ করার বর্ণনার পরে বর্ণিত হইয়াছে– অতঃপর আমার উপর প্রত্যেক দিবসের জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সহিত সাক্ষাতের পর আমাকে উপরের দিকে নেওয়া হইল, তথায় আমি এক মাঠে যাইয়া পৌঁছিলাম, সেখান হইতে আমি কলমের শব্দ (যাহা লেখার সময় সৃষ্টি হয়,) শুনিয়াছি। অমনি আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়া দিলেন। –মিশকাত– শাইখাইন হইতে

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম হাদীসে বর্ণিত ثُمَّ ছুম্মা শব্দ দ্বারা– যাহার অর্থ অতঃপর করা হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বাইতুল মা'মুর ভ্রমণ করার পর একটু বিলম্ব করিয়া নামায ফরয করা হইয়াছে।

আর দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত فَا 'ফা' শব্দ দ্বারা– যাহার অর্থ অমনি্ করা হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মাঠে যাওয়ার সাথে সাথেই কোন বিলম্ব না করিয়া নামায ফরয হওয়ার হুকুম আসিয়াছে।

উভয় হাদীসে লক্ষ্য করিলে এই কথাটি পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে, বাইতুল মা'মুর সম্মুখে আসার পরে মাঠে যাইয়া পৌঁছিলে অমনি নামায ফরয হয়। অতএব তারতীব বা ক্রমিকের আর কোন গোলমাল রহিল না। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে কলমের আওয়াজ শুনা দ্বারা আর একটি বিষয়ের প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ উক্ত মাঠ সিদরাতুল মুন্তাহা ও বাইতুল মা'মুরের উপরে।

এই মাঠটি আরো একটি কারণে সিদরাতুল মুন্তাহা ও বাইতুল মা'মুর হইতে উপরেই মনে হয়। আর সেই কারণটি এই হইতেছে যে, উক্ত কলম তাকদীর লেখার কলম। লাওহে মাহফুযে রক্ষিত সৃষ্টি সম্বন্ধীয় যাবতীয় আহকাম ও আদেশাবলী হইতে যে সমস্ত আহকামগুলি দৈনন্দিনের অংশ এবং যেগুলি দৈনিক নীচে নামিয়া আসে, এই কলমটি সেইগুলি নকল করিয়া থাকে।

সিদরাতুল মুন্তাহা সম্বন্ধে ১৮ নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, উপর হইতে যতগুলি আহকাম অবতীর্ণ হয়, উহা প্রথমে এই সিদরাতুল মুন্তাহায় আসিয়া পৌঁছে। {তারপর দুনইয়ায় আসে।} ইহাতে জানা গেল, সিদরাতুল মুন্তাহা উক্ত মাঠের নীচে। ঠিক এইরূপ বাইতুল মা'মুরও উহার নীচে অবস্থিত। যেহেতু বাইতুল মা'মুরের ভিত্তি সপ্তম আসমানে এবং সেইখানে ফেরেশ্‌তারা ইবাদাতে মাশ্‌গুল রহিয়াছে। يتنزل الامر بينهن {তাহাদের উপর আহকাম অবতীর্ণ হয়,} এই বাক্যে অমুম বা সাধারণভাবে সকল আসমানই শামিল আছে।
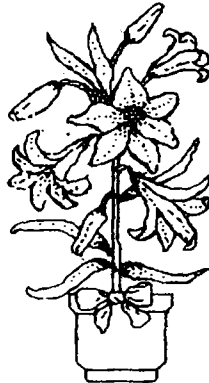
বিংশ পরিচ্ছেদ

জিবরাঈলের শেষ গন্তব্যস্থান

হযরত আলী (রাঃ) হইতে মি'রাজ অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত, বোরাকে চড়িয়া জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পর্দা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। সেইখানে পর্দার অভ্যন্তর হইতে এক ফেরেশ্‌তা বাহির হইয়া আসিলেন। তখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, ঐ জাতে পাকের কসম করিয়া বলিতেছি, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম সহকারে বিশ্বে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত এই ফেরেশ্‌তাকে আর কখনও দেখি নাই। অথচ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়া অনেক নিকটতম।

দ্বিতীয় আর একটি হাদীসে রহিয়াছে, হুজুর ফরমান, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া গেলেন, সর্বপ্রকারের আওয়াজ আমার শ্রবণ শক্তি হইতে দূরে চলিয়া গেল এবং সকল বিষয়ের ধ্বনি নিস্তব্ধ রহিল। –মুসলিম–শরহে নাবুবী

শিফাউচ্ছুদুর কিতাবে আবু রাবি বিন সাবাআর বরাত দিয়া আবুল হাসান বিন গালিব ইবনে আব্বাসের একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার নিকটে জিবরাঈল আসিয়াছিলেন এবং আমার মা'বুদের দিকে যাওয়ার পথে আমার সাথী ছিলেন। তিনি একটি বিশেষ স্থান পর্যন্ত যাইয়া থামিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, হে জিবরাঈল! বলুন তো, এমন স্থানে আসিয়া কোন বন্ধু তাহার বন্ধুকে পরিত্যাগ করে কি?

তিনি বলিলেন, আমি এখান হইতে যদি সম্মুখে অগ্রসর হই তাহা হইলে নূরের দ্বারা জ্বলিয়া শেষ হইয়া যাইব।

শেখ সা'দী (রাহঃ) এই হাদীসের তরজমা করিয়াছেন–

بدو گفت سالار بیت الحرام - که ای حامل وحی برتر خرام

چو در دوستی مخلصم یافتی - عنانم زصحبت چرا تافتی

بگفتا فراتر مجالم نماند - بماندم که نیروی بالم نماند

اگر یکی سر موی برتر پرم - فروغ تجلی بسوزد پرم-

উপরোল্লিখিত হাদীসে ইহাও বর্ণিত যে, অতঃপর আমাকে নূরের সহিত বিজড়িত করিয়া ৭০ হাজার পর্দা অতিক্রম করাইয়া দিল। উহাদের একটি পর্দাও অপরটির অনুরূপ ছিল না। সমস্ত মানুষ ও ফেরেশ্‌তাদের সাড়া–শব্দ আমা হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। {উহা একেবারেই নিরালা স্থান, কোন দিক হইতে কোন প্রকারের শব্দ আমি শুনিতে পাইতেছিলাম না।} এই সময় আমার ভয় লাগিতেছিল। এমন সময় আবু বকরের (রাঃ) আওয়াজের ন্যায় কে যেন আমাকে ডাক দিয়া বলিল, থামুন! স্থির হউন! আপনার মা'বুদ সালাতের মধ্যে মাশ্‌গুল রহিয়াছেন।

উক্ত হাদীসে ইহাও আছে, আমি আরজ করিলাম, এই দুইটি ঘটনা আমার নিকট আশ্চর্য মনে হইতেছে। {এক} আবু বকর কি করিয়া আমার আগে এখানে পৌঁছিয়াছেন। {দুই}আমার মা'বুদ তো সালাত হইতে বেনিয়াজ ও বে-মহতাজ। {যাঁহার সালাতের কোন প্রয়োজন নাই, তিনি আবার সালাতে কি করিয়া মাশ্‌গুল থাকেন?} এই সময় ইরশাদ হইল– হে মুহাম্মাদ! এই আয়াত পড়ুন!

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا-

–পারা–২২, সূরা আহ্‌যাব, রুকু–৫, আয়াত–৪৩

সুতরাং আমার সালাতের অর্থ আপনার ও আপনার উম্মাতের উপর 'রাহমাত' বর্ষণ করা। আর আবু বকরের আওয়াজ শুনার কাহিনী এই হইতেছে যে, আমি আবু বকরের আকৃতি দিয়া একজন ফেরেশতা তৈয়ার করিয়াছি। যে আবু বকরের আওয়াজ দ্বারা আপনাকে ডাকিবে, যাহাতে আপনার ভয় দূর হইয়া যাইবে। আর আপনার এমন অবস্থার সৃষ্টি যাহাতে না হয়, যাহা আপনাকে মাকসূদ বুঝিতে ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে বাধা দিবে।

রাফ্‌রাফের বর্ণনা

শিফাউচ্ছুদুর কিতাবের আর একটি হাদীসে রহিয়াছে যে, পর্দাসমূহ পার হইয়া যাওয়ার পর একটি রাফ্‌রাফ্ অর্থাৎ সবুজ গদি আমার জন্য অবতীর্ণ করা হইল। উহার উপর আমাকে উঠাইয়া উপরের দিকে আরশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। তথায় আমি এমন আজীমুশ্‌শান বিষয় দেখিয়াছি, যাহা বর্ণনা করার ভাষা নাই।

মাওয়াহিবের মধ্যে ইবনে গালিবের হাওয়ালা দিয়া বলা হইয়াছে, এই বর্ণনাগুলি শিফাউচ্ছুদুর হইতে নকল করা হইয়াছে।

والعهد عليه فى ذلك {১}

ব্যাখ্যা ঃ বায্‌যারের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বোরাকে চড়িয়া আসমানে উঠিয়াছেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

উপটীকা ঃ {১} অর্থাৎ থানভী (রাহঃ) বলিতেছেন যে, উপরোক্ত বর্ণনার সত্যাসত্য তাঁহার উপর বর্তিবে। অর্থাৎ মাওয়াহিবের লেখক আল্লামা কাসতালানীর উপর ইহার সত্যতা ছাড়িয়া দিলাম। —আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

[উপটীকা শেষ]

আপনি থামুন! "আপনার মা'বুদ সালাতে {রাহমাত বর্ষণে} মাশগুল রহিয়াছেন"। এই বাক্যে আল্লাহ তাআলা রাহমাত প্রেরণে মাশগুল থাকার কারণে হুজুরকে বলা হইল, আপনি থামুন। ইহার অর্থ এই নহে যে, হুজুর সামনে অগ্রসর হইলে রাহমাত প্রেরণে মাশ্‌গুল থাকার মধ্যে আল্লাহ তাআলার বাধা সৃষ্টি হইবে। নাউযু বিল্লাহ।

যেমন– সৃষ্টি জগতের কেহ একদিকে বা এক কাজে রত থাকিলে উহা তাহার অপর কাজে রত হওয়ায় বাধা দেয়, একই সঙ্গে কয়েক কাজে রত হওয়া সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নহে।

অতএব উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এই হইতেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এখন এক বিশেষ রাহমাত প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং আপনি ভ্রমণ বন্ধ করিয়া সেই রাহমাত লওয়ার কাজে রত হউন! কেননা ভ্রমণ আপনার একাগ্র চিত্ততা বিনষ্ট করিয়া রাহমাত গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিবে। আল্লাহই ভাল জানেন।
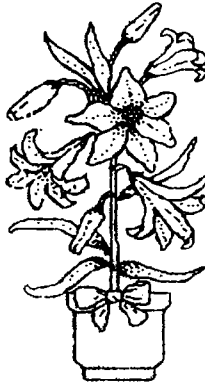
একবিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ দর্শন ও বাক্য বিনিময়

{ক} তিরমিযী হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলাকে দেখিয়াছেন।

{খ} আবদুর রাজ্জাক মুয়াম্মারের বরাত দিয়া হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি {হাসান} শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন।

{গ} ইব্‌নে খোজাইমা উপরোল্লিখিত আবদুর রাজ্জাকের হাদীসটিকে ওরওয়া বিন যুবাইরের (রাঃ) বর্ণনা গণ্য করিয়া {হুবহু এই হাদীসটি} লেখিয়াছেন।

{ঘ} ইব্‌নে আব্বাসের (রাঃ) সকল শিষ্য আল্লাহকে দেখার মতাবলম্বী ছিলেন।

{ঙ} কা'বুল আহবার, যোহরী ও মুয়াম্মার প্রমুখ সকলেই আল্লাহ তাআলাকে দেখার প্রতি দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

{চ} নাসায়ী ছহীহ সনদের সহিত ইকরামার সূত্র দ্বারা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

{ছ} নাসায়ীর এই হাদীসটিকে হাকিমও ছহীহ্ বলিয়াছেন। হাকিম আরও বলেন, তোমরা কি হযরত ইবরাহীমের দোস্তী (খলীল উপাধি), হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের বাক্যালাপ এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আল্লাহ দর্শন আশ্চর্য মনে করিতেছ?

{জ} তিবরানী মজবুত সনদের সহিত হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহকে দুই বার দেখিয়াছেন। একবার চক্ষু দ্বারা, আর একবার অন্তর দ্বারা।

{ঝ} খিলাল خـلال কিতাবুস সুন্নাহর মধ্যে মারুজী হইতে নকল করিয়াছেন, আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষেরা বলাবলি করিতেছে যে, "হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহকে দেখিয়াছেন, এমন ধারণা যেব্যক্তি করিবে সে আল্লাহ তাআলার উপর বড় মিথ্যা ধারণা করিয়াছে।" তাহা হইলে এখন কোন্ দলীলের দ্বারা হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তব্যের জবাব দেওয়া যাইবে? উত্তরে ইমাম আহমাদ বলিলেন, স্বয়ং নবী আলাইহিস্ সালামের এই বাক্য رَأَيْتُ رَبِّىْ অর্থাৎ "আমি আমার প্রভুকে দেখিয়াছি" দ্বারা জবাব দিবে। (ইমাম আহমাদের বর্ণনা দ্বারা এই হাদীসটি رَأَيْتُ رَبِّىْ মারফু হাদীস হিসাবে গণ্য হইল।)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা আল্লাহ তাআলার সহিত বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া ছহীহ হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

{১} ★ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হইয়াছে। ★ সূরা বাকারার শেষের অংশ দান করা হইয়াছে। ★ আপনার উম্মাত হইতে যেব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সহিত কাহাকেও শরীক না করিবে, তাহার পাপ ক্ষমা করা হইল। -(মুসলিম)

{২} এই কথারও ওয়াদা করা হইয়াছে, যেব্যক্তি কোন পুণ্য কাজের ইচ্ছা করিবে কিন্তু উহা পুরা করিতে পারিল না, তবুও তাহাকে একটি নেকী দান করা হইবে। আর যদি উহা পুরা করিতে পারে তাহা হইলে (কমপক্ষে) সে দশটি নেকী প্রাপ্ত হইবে।

আর যেব্যক্তি পাপ কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা পুরা করিতে পারিল না, তাহা হইলে উহা লেখাই হইবে না। যদি সে উক্ত পাপ কার্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে মাত্র একটি পাপ লেখা হইবে। -(মুসলিম)

{৩} হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বাইহাকী একটি বিরাট হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সংক্ষেপে এখানে প্রদত্ত হইল–

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরজ করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি {ক} হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে খলীল– দোস্ত বানাইয়াছেন এবং তাঁহাকে বিরাট রাজ্য দান করিয়াছে ; হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সহিত কথা বলিয়াছেন। হযরত দা ঃদ আলাইহিস সালামকে বিরাট রাজ্য ও লৌহ নরম করার শক্তি এবং পাহাড় অনুগত রাখার ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে মানুষ, জিন, শয়তান ও বায়ু বশে রাখার ক্ষমতা এবং তুলনাবিহীন মহারাজ্য দান করিয়াছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ইঞ্জিল ও তৌরাত কিতাব প্রদান করিয়াছেন এবং জন্মান্ধ ও শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করার শক্তি আর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। তাঁহার আম্মা মারইয়ামকে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের এই সকল জিনিসের বিনিময়ে আমাকে কোন্ কোন্ বস্তু দান করিয়াছেন?

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি আপনাকে {১} হাবীব বানাইয়াছি। {২} সকল মানুষের নবী বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি। {৩} আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছি। {৪} বোঝা নামাইয়া দিয়াছি। {৫} আপনার যিকির ও আলোচনাকে সমুন্নত করিয়াছি, সেই জন্যই তো যখন আমার আলোচনা হয় তখন আপনার আলোচনাও করিতে হয়। {৬} আপনার উম্মাতদিগকে উত্তম উম্মাত এবং ইনসাফ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত উম্মাত বানাইয়াছি। তাহাদিগকে আউয়াল ও আখির বানাইয়াছি। তাহাদের কোন খোতবা বা বক্তৃতা দুরস্ত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আপনার সম্বন্ধে আবদ (বান্দা) ও

রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য না দিবে। আল্লাহ্ তাআলা আপনার উম্মাতের মধ্যে এমন ধরনের কিছু লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের অন্তরে তাঁহার কিতাব {কুরআন} রাখিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ হাফিজে কুরআন বানাইয়াছেন।

{৭} আপনাকে (নূরের আলমে) সকলের আগে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নবীরূপে সকলের পরে দুনইয়াতে পাঠাইয়াছেন। {৮} কিয়ামতের দিবসে মীমাংসার ব্যাপারে সকলের পূর্বে আপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। {৯} আপনাকে 'সাব্‌উল মাসানী' {সূরা ফাতেহা} প্রদান করা হইয়াছে। {১০} সূরা বাকারার খাওয়াতীম– শেষের অংশ বিনা অংশীদারে আপনাকে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে কোন পয়গাম্বরের অংশ নাই। {১১} কাউসার {১২} ইসলাম {১৩} হিজরত {১৪} জিহাদ {১৫} নামায {১৬} ছাদকা {১৭} রমযানের রোযা প্রদান করিয়াছি। {১৮} এবং সৎকাজে উপদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ দানকারী বানাইয়াছি। {১৯} বিজয়ী ও {২০} খাতিম অর্থাৎ শেষ নবীর পদ দান করিয়া মহর মারিয়া দিয়াছি। আপনার পরে আর কোন নবী কোন কালে পাঠাইব না।

এই হাদীসটির রাবীদের মধ্যে আবু জাফর (রাঃ) রহিয়াছেন। যাঁহাকে ইব্‌নে কাছীর 'জয়ীফুল হিফ্‌জ' (মুখস্থ রাখার শক্তিতে দুর্বল) আখ্যা দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ {১} কতিপয় সাহাবা (রাঃ) আল্লাহকে দর্শন করা সম্পর্কে অস্বীকার করিয়াছেন। আসলে ইহা তাঁহাদের নিজস্ব রায় এবং ব্যক্তিগত মত মাত্র। (১)

টীকা ঃ (১)

كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَا اَوْرَدَ عَلَيْهِ فِيْ فَتْحِ الْبَارِيِّ بِقَوْلِ عَائِشَةَ (رَضِ) فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা ঃ

اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ-وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ مَرْدُوِيَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ لاَ اِنَّمَا رَاَيْتُ جِبْرِيْلَ مُنْهَبِطًا حَيْثُ حَكَتِ النَّفِىَّ عَنْهُ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَهُوَلاَئِ جَزَمَ النَّوْوِىُّ بِاَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَنْفِ الرُّوْيَةَ (بِحَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ) عَجِيْبُ فَاَقُوْلُ هٰذَا الْاِيْرَادُ عَجِيْبٌ لِاَنَّ النَّفِىَّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ اِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّوْيَةِ الْخَاصَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ لاَمُطْلَقُ الرُّوْيَةِ-اَلْكَلاَمُ فِىْ مَطْلَقِهَا فَافْهَمْ-

উপরোল্লিখিত আরবী ইবারতের সারমর্ম এই হইতেছে যে, কোন কোন বর্ণনায় হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম اَهَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ "আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখিয়াছেন?"

উত্তরে তিনি ফরমাইলেন—"না, আমি জিবরাঈলকে দেখিয়াছি।"

হযরত আয়েশার এই বর্ণনা দ্বারা যদি কেহ এই সন্দেহ করেন যে, যাঁহারা আল্লাহকে দেখার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা নিজস্ব রায় দ্বারা বলেন নাই, বরং তাঁহারা আয়েশার এই হাদীস দ্বারাই দলীল লইয়াছেন, তাঁহাদের এই সন্দেহের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

–যাহা তাঁহারা কতিপয় 'অমুমাত' অর্থাৎ সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য এমন ধরনের শব্দ হইতে গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন। {গবেষণা কোন কোন সময় ভুলে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলি অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা খাস বা নির্দিষ্ট হইয়া গেলে আর সাধারণ থাকে না।} যেমন– لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ তাঁহাকে {আল্লাহ্‌কে} কোন চক্ষু নাগাল পাইবে না, দর্শন করিতে পারিবে না।

কিন্তু কুরআন ও হাদীস দ্বারা দেখার বিষয়টি প্রমাণিত হইয়া গেলে তখন এইরূপ সাধারণ অর্থবোধক শব্দ আর সাধারণ শব্দ হিসাবে থাকিবে না। সেই সময় উক্ত না দেখার শব্দটি কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করা এবং তাঁহাকে বেষ্টনীভাবে দর্শন করা। {এবং এইরূপভাবে জানা ও দেখা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাই আয়াতের অর্থ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।}

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা ঃ

সন্দেহকারীদের জবাব ঃ এইখানে মতলাক্ অর্থাৎ যেকোন প্রকারের দেখা সম্পর্কে হযরত আয়েশা জিজ্ঞাসা করেন নাই। বরং তিনি وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى {অর্থ ঃ তিনি তাঁহাকে আরও একবার দেখিয়াছেন।} এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অর্থাৎ ইহার অর্থ কি আল্লাহ? ইহাই জিজ্ঞাস্য ছিল। উত্তরে হুজুর বলিলেন– না, আল্লাহ্ নহে। যেরূপভাবে মুসলিমের এই হাদীসের মধ্যেই هَلْ رَاَيْتَ স্পষ্ট রহিয়াছে এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনার মধ্যে ফাতহুল বারীতে এইরূপেই هَلْ رَاَيْتَ রহিয়াছে। –মুসলিমের টীকা দ্রষ্টব্য

[টীকা শেষ]

হুজুর যে বাক্যটি বলিয়াছিলেন ঃ- نــورانـــى اراه ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে যে, যেই দরজা {বা স্থান কিংবা যে মর্তবা} দেখার বাধাদানকারী নূর হইয়া থাকে, সেই দরজা আমার দর্শনে আসে নাই।

আখিরাতে এই নিয়ম পরিবর্তন হইয়া যাইবে। সেইখানে নূর আসিয়া দেখার বাধা সৃষ্টি করিবে না। তখন দর্শনে এমন স্পষ্টতা আসিয়া যাইবে যাহা হইতে অধিক স্পষ্টতা মানবীয় শক্তির পক্ষে সম্ভব হইবে না।

অতএব না দেখার এই সকল বর্ণনা দ্বারা মতলাক্ বা সাধারণ দর্শনকে নিষেধ করা হইতেছে না।

{২} সূরা বাকারার আখিরী অংশ ও অন্যান্য বিষয় মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া মি'রাজ হাদীসের বিপরীত হয় নাই। মি'রাজ রজনীতে এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আর মদীনায় বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে।

{৩-**ফরয নামায ঃ**} পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিলিয়াছে। ইহার অর্থ শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত রহিয়াছে। এই সকল কথাবার্তা মাকামে রুইয়াত- দর্শন করার স্থানে হইয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যে বুঝা যায়। ১৯ নম্বর পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের একটি প্রমাণও রহিয়াছে যে, কলমের আওয়াজ শ্রবণ করার পর নামায ফরয হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কলমের আওয়াজ শুনার স্থানই কথা বলার স্থান। এখানে শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, আগে কলমের আওয়াজ শুনিয়াছেন, পরে হয়ত অগ্রসর না হইয়া সে স্থানেই বাক্যালাপ করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ স্থান পরিবর্তন করিবার পূর্বে সে স্থানেই নামায ফরয হইয়াছে।

যেই সমস্ত বিষয়াদির আলোচনা হইয়াছে, সেই সবগুলি এই একই সময় হইয়াছে, সেই হিসাবে অন্যান্য বিষয়াদির কথাবার্তাও এই সময়ই হইয়া থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত কা'বের (রাঃ) হাদীস ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهٗ وَكَلَامَهٗ بَيْنَ مُحَمَّدٍ (ص) وَمُوْسٰى عَـه (ترمذى)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এবং কথা বলিবার জন্য মূসা (আঃ)-কে নির্বাচিত করিয়া তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে উক্ত বিষয় দুইটি ভাগ করিয়া দিয়াছেন। -(তিরমিযী)

হুজুর (সঃ) আল্লাহর সহিত মোটেই কথা বলেন নাই, উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা এমন কথা বুঝান হইতেছে না। কেননা এখানে "একবারের পরে আবার কথা বলা এবং বার বার কথা বলার সাধারণ অভ্যাস হওয়া"- ইহাই হইতেছে এই হাদীসের ভাবার্থ। সুতরাং হাদীসে দুই বা ততোধিক বার কথা বলার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অথচ হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বিশেষভাবে, খাস নিয়মে শুধু এই একবারই আল্লাহ তাআলার সহিত কথা বলিয়াছিলেন, দুই বার নহে।

এমনকি উক্ত হাদীসেই এই কা'বের (রাঃ) বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

فَكَلَّمَ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ وَرَاٰهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ

অর্থ ঃ "হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর সহিত দুই বার কথা বলিয়াছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) দুই বার আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছেন।" {১}

আর এই হাদীসে বর্ণিত وَرَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ দুই বার দেখার অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই হইবে, যাহা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন – একবার অন্তরের দ্বারা আর একবার চোখের দ্বারা দেখিয়াছেন।

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (সঃ)–এর পূর্বে আর কেহ আল্লাহর সহিত কথা বলেন নাই। {ইহাতে হযরত মূসার (আঃ) কথা বলা নিষিদ্ধ হয় নাই। কেননা} হাদীসের অর্থ, এত বড় মহা মর্যাদাশালী সত্তার অধিকারী হইয়া আর কেহই আল্লাহর সহিত কথা বলেন নাই। {২}

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ "দোস্তী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের জন্য নির্দিষ্ট আর দর্শন লাভ করা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট।" বন্ধুত্বের কোন অংশ বা বিশেষ কোন নিদর্শন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের জন্য খাস ছিল। ইহাই হইতেছে হাদীসের ভাবার্থ। অতএব হাদীসের বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ও

উপটীকা ঃ {১} প্রকৃতপক্ষে উপরে যে প্রতিবাদ করা হইয়াছিল, উহা এই উক্তিটির প্রতিবাদ ছিল। অতএব হুজুরের একবার কথা বলার সহিত উপরোল্লিখিত হাদীসের কোন বিরোধ নাই।

{২} হুজুর কথা বলিয়াছেন সিদরাতুল মুন্তাহার উপরে বিশেষ মর্যাদার স্থানে, আর মূসা (আঃ) কথা বলিয়াছেন তুর পাহাড়ে। **[উপটীকা শেষ]**

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত দোস্তী বন্ধুত্বের মৌলিক সম্পর্কের বিন্দুমাত্র কোন বিরোধ ঘটে নাই।

"নেকীর ইচ্ছা করিলে উহা লেখা হয় আর পাপের ইচ্ছা করিলে উহা লেখা হয় না।"– হুজুর (সাঃ)-এর এই হাদীসের অর্থ দ্বারা দৃঢ় সঙ্কল্প মাকসূদ নহে। কেননা দৃঢ় সঙ্কল্প স্বয়ং একটি আমল। পাপ কাজের দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে উহা লেখা হয়।

মনের বাসনা– যতক্ষণ পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত করার মজবুত ও দৃঢ় ইচ্ছা না হয় লেখা হয় না। বস্তুতঃ যদি পুণ্যের বাসনা দূর করার ইচ্ছা না হয় এবং পাপের বাসনা দূর করার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এমতাবস্থায় পুণ্য লেখা হইবে, আর পাপ লেখা হইবে না, ইহাই হাদীসের মর্ম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঊর্ধ্ব হইতে আসমান অভিমুখে প্রত্যাবর্তন

আসমানের ঊর্ধ্ব হইতে আসমানের দিকে রওনা দেওয়ার ঘটনাবলী।

বোখারীর বর্ণনানুযায়ী বাইতুল মা'মুর ভ্রমণ এবং শরাব, দুগ্ধ ও মধুর পাত্র উপস্থিত হওয়ার পর (এইগুলির বর্ণনা ১৮ নং পরিচ্ছেদে চলিয়া গিয়াছে।) হাদীসের বর্ণনা এই হইতেছে যে-

অতঃপর আমার উপরে রাত্র ও দিবসের জন্য মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হইল। এর পর ফিরিয়া রওনা দিলাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করা কালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ {بما امرت} আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কি বিষয়ের হুকুম দেওয়া হইয়াছে? {১} আমি বলিলাম, প্রতিদিনের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনার উম্মাতেরা কখনও পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায প্রত্যেক দিন পড়িতে সক্ষম হইবে না।

উপটীকা ঃ {১} মনে হয়, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পূর্ব হইতে জানা ছিল যে, মি'রাজ রজনীতে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম {ক} আল্লাহ্র দর্শন লাভ করিবেন, {খ} কথা বলিবেন, {গ} এবং বিশেষ ধরনের কিছু হুকুম প্রাপ্ত হইবেন। তবে কি বিষয়ের হুকুম প্রাপ্ত হইবেন ইহা তাঁহার জানা ছিল না। তাই তিনি আল্লাহ্ দর্শন ও কথাবার্তা হইয়াছে কি এবং কোন হুকুম পাইয়াছেন কি? ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন না করিয়া সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলেন- বিশেষভাবে কি বিষয়ের আদেশ পাইয়াছেন? হুকুম তো নিশ্চয়ই হইয়াছে, উহা জানিবার বিষয় নহে, তবে কি বিষয়ের হুকুম হইয়াছে উহাই জানিবার অভিপ্রায়। [উপটীকা শেষ]

আল্লাহ্‌র কসম, আপনার পূর্বে আমি আমার উম্মাতদিগকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলদিগকে ইবাদাত পালনের হুকুম দিয়া খুব ভালভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট (অর্থাৎ যেইখানে এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছেন সেইখানে) পুনরায় গমন করুন এবং উম্মাতের জন্য কঠিন হুকুমকে সহজ করার উদ্দেশে তাঁহার দরবারে দরখাস্ত পেশ করুন। হুজুর বলিলেন, তখন {১}আমি আবার ফিরিয়া গেলাম, আল্লাহ্ তাআলা দশ ওয়াক্ত নামায কমাইয়া দিলেন। আমি পুনরায় মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে এই বারও তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় উপদেশ দান করিলেন। {২} আমি আবার আল্লাহ্ পাকের সমীপে উপস্থিত হইলাম। করুণাময় আগের বারের মতই দশ ওয়াক্ত নামায কমাইয়া দিলেন। এরপর মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট পৌঁছিলে তিনি পূর্বের ন্যায় ঐ একই পরামর্শ দিলেন। {৩} আমি আবার মা'বুদের দরবারে ফিরিয়া গেলাম। এই বারও আল্লাহ্ পাক দশ ওয়াক্ত নামায কমাইয়া দিলেন। তারপর মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট আসিলে তিনি পূর্বের ন্যায় ঐ একই পরামর্শ দিলেন। {৪} আমি আবার আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরিয়া গেলাম। এই বার {দয়াময় আল্লাহ দয়া করিয়া আরো দশ ওয়াক্ত নামায কামাইয়া দিলেন। অতঃপর} আমার উপর প্রতিদিনের জন্য অবশিষ্ট মাত্র দশ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ করা হইল। পুনরায় মূসা অলাইহিস্ সালামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে পূর্বের মত সেই উপদেশই দান করিলেন। {৫} আমি আবার আল্লাহর দরবারে ফিরিয়া গেলাম। এইবার {আল্লাহ্ তাআলা সদয় হইয়া আরো পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমাইয়া দিলেন এবং সর্বশেষে নির্দিষ্টভাবে} প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম আমাকে দান করিলেন।

অবশেষে মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বিষয়ের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বলিলেন, আপনার উম্মাত (অর্থাৎ সকল উম্মাত) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতেও সক্ষম হইবে না। আমি আপনার পূর্বে লোকদিগকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলদিগকে ইবাদাত পালনের হুকুম দিয়া খুব ভালভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট পুনরায় তাশরীফ নিন এবং আপনার উম্মাতের বোঝা আরো কমাইয়া দেওয়ার আরজ করুন!

হুজুর ফরমাইলেন, আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে বহু বার আবেদন করিয়াছি। এখন আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। (যদিও পুনরায় দরখাস্ত করার পথ সুপ্রশস্তই আছে।) {তবুও লজ্জার কারণে আর দরখাস্ত করিব না।} আমি এই পাঁচ ওয়াক্তের উপরই সন্তুষ্ট এবং ইহাকেই মানিয়া লইলাম।

হুজুর আরো বলেন- যখন আমি সেইখান হইতে সামনে অগ্রসর হইলাম, এমন সময় এক ঘোষণাকারী (আল্লাহর পক্ষ হইতে) ঘোষণা করিলেন যে, আমি আমার ফরয পঞ্চাশ ওয়াক্ত {গণনার দিক দিয়া এবং ছাওয়াব দানে} ঠিকই রাখিয়াছি। আর আমার বান্দাদের উপর বোঝা হালকা করিয়া দিয়াছি।

মুসলিম শরীফে রহিয়াছে, পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত করিয়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত হাদীসের শেষের দিকে ইহাও বলা হইয়াছে, হে মুহাম্মাদ! প্রতিদিনের এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতিটি ওয়াক্ত দশ ওয়াক্তের সমতুল্য, অতএব পঞ্চাশ ওয়াক্তই হইয়া গেল।

নাসায়ীতে লেখা রহিয়াছে, হুজুর বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বলিলেন, যেই দিন আমি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছি, সেই সময় আপনার ও আপনার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং আপনি ও আপনার উম্মাতগণ নিয়মিতভাবে প্রতিদিন উহা পালন করিতে থাকুন! এই হাদীসটিতে ইহাও আছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বলিয়াছেন– বনী ইস্রাঈলদের উপর মাত্র দুই ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল, তবুও তাহারা উহা আদায় করিতে পারে নাই।

এই হাদীসের শেষের দিকে রহিয়াছে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। আপনি ও আপনার উম্মাতগণ যথাযথভাবে নিয়মিতরূপে পালন করিতে থাকুন। হুজুর বলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে সুদৃঢ় বাক্য ও মজবুত বিধান। যখন মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট পৌঁছিলাম, তখন তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় ফিরিয়া যান (এবং কমাইয়া আনুন), কিন্ত আমি আর ফিরিয়া গেলাম না।

শাইখানের হাদীসের মধ্যে বর্ণিত, নামাযের ওয়াক্ত কম হইতে হইতে যখন পাঁচ ওয়াক্ত রহিল, সেই সময় বলা হইল, এই পাঁচ (ওয়াক্তই ছাওয়াবের দিক দিয়া) পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমতুল্য। আমার এখানে কোন কথা পরিবর্তন হয় না। (অর্থাৎ তাক্দীরের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছাওয়াব লেখা ছিল এবং পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পরিবর্তন হইয়া পাঁচ ওয়াক্তে আসিয়া পৌঁছিবে, ইহাও তাকদীরে লেখা ছিল। সুতরাং তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, যেমন লেখা ছিল তেমনই হইয়াছে)। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ নামায ফরয হওয়ার পর হুজুর চলিয়া আসিয়াছেন– ইহার অর্থ এই নহে যে, নামায ফরয হওয়ার সাথে সাথেই একটুও দেরী না করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ দেখা সাক্ষাত কথাবার্তা ইত্যাদি সব কিছু সমাধা করিয়া তারপর ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দশ দশ করিয়া কমাইবার অর্থ প্রতি দুই বারে দশ ওয়াক্ত করিয়া কমান হইয়াছে। দশ ওয়াক্ত করিয়া কমাইবার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে পাঁচ ওয়াক্ত করিয়া কম করার হাদীসের সহিত আর কোন বিরোধ থাকে না। {১}

নাসায়ীর বর্ণনায় এবং মিশকাতে বর্ণিত শাইখাইনের হাদীসে হুজুরের লজ্জাবোধ হওয়া এবং পুনরায় {নামায কমাইবার} আবেদন না করার যে কথাটি রহিয়াছে, উহার কারণও জানা গেল –"এই পাঁচই পঞ্চাশের সমান, আমার এখানে কোন কথা পরিবর্তন হয় না।" আল্লাহ্ তাআলার উক্ত বাক্যে যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, এই পাঁচ ওয়াক্তের কম করা যাইবে না। তথাপি বাক্যের ইঙ্গিত দ্বারা হুজুর বুঝিয়া নিলেন, এই পাঁচ ওয়াক্ত হওয়াই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি ছিল। সেই জন্যই তিনি আল্লাহ্র দরবারে আবার আবেদন করা লজ্জা মনে করিলেন। কেননা, এই পাঁচ ওয়াক্তও পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান, ছাওয়াবের দিক দিয়া কোন কম নাই।

উপটীকা ঃ {১} এইখানে এমনও হইতে পারে যে, হয়ত দরখাস্তের প্রথম দিকের কয়েক বারে দশ দশ করিয়া এবং শেষে যাইয়া পাঁচ পাঁচ করিয়া কমান হইয়াছে। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে উভয় হাদীস নিজ নিজ স্থানে ঠিকই থাকে এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কোন প্রশ্নই উঠে না। যেমন– কোন লোক তাহার মনিবের নিকট কিছু টাকা পাওয়ার আশায় একটি দরখাস্ত বার বার করিলে মনিব প্রথমে মোটা অঙ্কের টাকা মঞ্জুর করেন। পরে আবার দরখাস্ত করিলে প্রথম বার যেই টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন দ্বিতীয় বারে তার থেকে কিছু কম মঞ্জুর করিয়া থাকেন। প্রতিবারের দরখাস্তে সমান টাকা মঞ্জুর হয় না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। **[উপটীকা শেষ]**

ইহাই হইতেছে এই বাক্যের অর্থ, এই পাঁচ সংখ্যার কম হইতে পারিবে না বা এর কম করা যাইবে না- এমন কথা উক্ত বাক্যে নাই। যদি পাঁচ ওয়াক্ত না হইয়া আরও কম হইত তবুও ছাওয়াব কমিত না এবং সেই সংখ্যাও {চারি বা অন্য কোন ক্ষুদ্র সংখ্যা} পঞ্চাশের সমতুল্য হইত।

বস্তুতঃ এইখানে পাঁচ সংখ্যাকে পঞ্চাশের সমান বলার দ্বারা পাঁচের কম হইলে আর পঞ্চাশের সমতুল্য হইবে না, এইরূপ কোন কিছুই অপরিহার্য হইয়া পড়ে নাই। হাঁ, ইহার অর্থ শুধু এতটুকু ছিল যে, এই সংখ্যার ফযীলত ইহার কম হইবে না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর দিকে রওনা

আসমান হইতে পৃথিবী অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপঞ্জি ঃ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন। আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী, যাঁহার নাম "হিন্দা" ছিল। তিনি মি'রাজুন্নবী সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, মি'রাজ রজনীতে হুজুর আমার গৃহে ইশার নামায পড়িয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন {১}, আমরাও ঘুমাইয়া পড়িলাম। অতঃপর ফজরের পূর্বে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদিগকে জাগ্রত করিলেন। হুজুর ফজর নামায পড়িলেন। আমরাও তাঁহার সহিত নামায পড়িলাম {২}। নামায বাদ হুজুর ফরমাইলেন– হে উম্মে হানী! তোমরা তো দেখিয়াছ আমি ইশার নামায তোমাদের সাথেই পড়িয়াছি। {এবং তোমাদের নিকটেই নিদ্রা গিয়াছিলাম।} এর পর আমি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছি এবং সেখানেও নামায পড়িয়াছি। পুনরায় এখন তোমাদের সাথে নামায পড়িলাম, যাহা তোমরা দেখিলে। এই কথাগুলি বলার পর হুজুর গৃহের বাহিরের দিকে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। এমন সময় আমি তাঁহার চাদরের একপার্শ্ব ধরিয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি এই কাহিনী লোকদিগকে বলিবেন না। কারণ ইহাতে আপনাকে তাহারা বিশ্বাস করিবে না এবং আপনাকে যন্ত্রণা দিবে।

উপটীকা ঃ {১} তখন হয়ত বিশেষ ধরনের অন্য কোন নামায় ছিল।

{২} উক্ত বাক্য দ্বারা হুজুরের সাথে শামিল হইয়া জামাআতে নামায পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার হয়ত একই সময় পৃথকভাবে নামায পড়িয়া থাকিবেন, উহারও অবকাশ আছে। [উপটীকা শেষ]

উত্তরে হুজুর বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি মানুষের নিকট এই ঘটনা অবশ্যই বর্ণনা করিব। {উম্মে হানী বলেন,} আমি আমার এক নিগ্রো দাসীকে বলিলাম, তুমি তাঁহার পিছে পিছে যাও, তাহা হইলে তিনি লোকদিগকে কি বলিবেন, আর লোকেরা তাঁহাকে কি বলে সবই শুনিতে পারিবে।

হুজুর বাহিরে আসিয়া জনতার সামনে এই সংবাদ দিলে তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! ইহার সপক্ষে কোন নিদর্শন আছে কি? (যাহা দ্বারা আমাদের বিশ্বাস আসিবে।) কেননা আমরা এইরূপ অলৌকিক কথা আর কখনও শুনি নাই।

{ক} হুজুর বলিলেন, উহার নিদর্শন এই হইতেছে যে, অমুক মাঠে অমুক গোত্রের কাফেলার সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছিল, যাহাদের একটি উট ভাগিয়া গিয়াছিল, আমি তখন উহার সঠিক ঠিকানা বলিয়া দিয়াছি। সেই সময় আমি শামের দিকে যাইতেছিলাম। (অর্থাৎ ইহা এই সফরের প্রথম দিকের ঘটনা ছিল।)

{খ} পুনরায় আমি যখন ফিরিয়া আসি তখন "দাজনান" নামক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, সেই সময় তাহারা নিদ্রা যাইতেছিল। তাহারা একটি পাত্রে পানি রাখিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। আমি ঢাকনা উঠাইয়া পানি পান করিলাম এবং যথানিয়মে ঢাকনা দিয়া রাখিলাম।

ইহাও উহার নিদর্শন যে, তাহাদের কাফেলা বর্তমানে 'বাইদা' হইতে 'ছানিয়াতুত তানঈমের' দিকে আসিতেছে। তাহাদের সকলের আগে একটি মাটিয়া রংয়ের উট আসিতেছে। উহার পিঠের উপর দুইটি বস্তা রহিয়াছে। একটি কালো বস্তা, আর একটি ডোরা দেওয়া বস্তা।

{হুজুর (সাঃ)-এর বক্তব্য এই পর্যন্ত শুনামাত্র হুজুরের কথা সত্য কিনা ইহা জানিবার উদ্দেশে সাথে সাথেই} একদল মানুষ 'ছানিয়াতুত তানঈমের' দিকে দৌড়াইয়া গেল। তাহারা সেখানে যাইয়া প্রথমে ঐ উটটিই দেখিতে পাইল, যাহার বর্ণনা হুজুর (সাঃ) দিয়াছেন। লোকেরা বণিকদিগকে পানি পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, হাঁ, আমরা তো পানি পূর্ণ করিয়াই পাত্র ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম, পরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলাম ঢাকনা ঠিকই রহিয়াছে, কিন্তু পানি নাই।

{লোকেরা হুজুর (সাঃ)-এর কথাকে আরো সত্যায়িত করার জন্য} দ্বিতীয় বণিক দলকেও (যাহাদের উট ভাগিয়া যাওয়া সম্পর্কে হুজুর (সাঃ) ফরমাইয়াছিলেন) তাহাদের উট সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, এই সময় এই বণিক দল মক্কায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। উত্তরে তাহারা বলিল, ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি {হুজুর} সব কথা ঠিক ঠিক বলিয়াছেন। সত্যই ঐ মাঠে আমাদের উট ভাগিয়া গিয়াছিল, সেই সময় আমরা এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তিনি উটের দিকে আমাদিগকে ডাকিতেছিলেন, ফলে আমরা উট ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। –(সীরাতে ইব্‌নে হিশাম)

বাইহাকীর হাদীসে বর্ণিত, তাহারা হুজুরের নিকট নিদর্শনের দরখাস্ত করিয়াছিল, তদুত্তরে হুজুর (সাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, {ইহার নিদর্শন এই হইতেছে যে,} বুধবারে ঐ কাফেলা আসিয়া পৌঁছিবে। ঐ বুধবার সূর্য অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী সময় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অথচ বণিক দল এখনও আসিয়া পৌঁছিল না। তখন হুজুর (সাঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করিলেন, তাহাতে সূর্যাস্ত বন্ধ হইয়া গেল, এই দিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই হুজুর (সাঃ)-এর কথিত বর্ণনানুযায়ী বণিক দল আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্যাখ্যা ঃ এই ব্যাখ্যাগুলি দ্বারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথম বিষয় ঃ ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময় মি'রাজ ভ্রমণে যাওয়া ও আসা প্রভৃতি সব কিছু সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

{ক} যদিও তখন ইশার নামায ফরয ছিল না, তবুও হুজুর (সাঃ) পড়িতেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণও হুজুর (সাঃ)-এর সাথে এই নামাযে শরীক থাকিতেন।

{খ} ফজরের উক্ত নামায যদিও মি'রাজ হইতে আসিবার পরে পড়িয়াছিলেন। {সেইহেতু উক্ত ফজরের নামায মি'রাজে প্রাপ্ত নামায বলিয়াই অনুমিত হইতেছে।} কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সর্বপ্রথম যুহর নামাযের ইমামতি করিয়াছিলেন। ইহাতে সর্বাধিক ধারণা, যুহরের ওয়াক্ত হইতে নামায ফরয হওয়া আরম্ভ হইয়াছে। {সুতরাং বোধহয় সেই দিনকার ফজরের নামায ফরয হিসাবে পড়েন নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।}

{গ} বাইতুল মুকাদ্দাসে যেই নামায পড়িয়াছিলেন উহা সম্বন্ধে কোন কোন বর্ণনায় حانت الصلوة বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা হইলে উহাকে ইশার নামায বলা মুশ্কিল। কেননা হুজুর ইশা ত আগেই পড়িয়া নিয়াছেন। তবে বাইতুল মুকাদ্দাসের এই নামায সম্ভবতঃ তাহাজ্জুদ নামায হইবে। বস্তুতঃ দীর্ঘ দিন যাবত হুজুর (সাঃ)-এর উপর তাহাজ্জুদ নামায ফরয ছিল।

আযান ঃ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের এই আযান তাহাজ্জুদের জন্য হইয়া থাকিবে। যেইরূপভাবে তখনকার সময় রামাযানুল মুবারাক মাসে হযরত বিলালের (রাঃ) উপর তাহাজ্জুদের আযান দেওয়ার হুকুম ছিল {১}

উপটীকা ঃ {১} বুখারী ও আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ দ্বারা জানা যায়, আযানের সূচনা হয় প্রথম হিজরীতে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় বিষয় ঃ প্রমাণিত হইয়াছে যে, মি'রাজ সশরীরে হইয়াছিল, তাহা না হইলে লোকেরা মিথ্যা মনে করার কি কারণ হইতে পারে? আর হুজুর (সাঃ)ও কেন তাহাদের মিথ্যার জবাবে এই কথ, বলিয়া দিতেছেন না যে, ইহা সশরীরে নহে বরং রূহানী বা আত্মিক কিংবা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে হইয়াছিল। হুজুর (সাঃ)-এর এইরূপ কথা দ্বারা সব কিছুই চুকিয়া যাইত। কেহই আর মি'রাজকে মিথ্যা মনে করিত না এবং সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন দিকে এইরূপ দৌড়াদৌড়িও করিত না। কেননা যত দূরত্বের স্বপ্নই হউক না কেন, স্বপ্নের কথাকে কেহই অবিশ্বাস করে না এবং উহা লইয়া চতুর্দিকে কোন হৈ চৈও পড়ে না। স্বপ্নের বর্ণনায় দূর হইতে মহাদূরের বিষয়ের দাবীও গৃহীত হওয়ার অবকাশ রাখে।

পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

অথচ মি'রাজ হইয়াছে হিজরতের পূর্বে। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহা হইলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মি'রাজ রজনীতে এবং হযরত বিলাল (রাঃ) তৎকালে হিজরতের পূর্বে কি ধরনের আযান দিয়াছিলেন। ইহার সম্ভাব্য জওয়াব এই হইতে পারে যে,

{ক} আযানের অর্থ আহ্বান করা, ঘোষণা করা। এইখানে আযানের উদ্দেশ্য নামাযের ঘোষণা পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং মুসলমানদিগকে নামাযের দিকে আহ্বান করা। এই আহ্বান যেকোন আহ্বানসূচক শব্দ দ্বারা হইতে পারে।

{খ} হিজরতের পূর্বেও আযান দেওয়ার রীতি ছিল, তবে বর্তমানের নিয়মানুযায়ী হুবহু এই শব্দ দ্বারা ছিল কিনা উহা ঠিক করিয়া বলা মুশকিল।

{গ} তখনকার আযান শুধু তাহাজ্জুদের জন্য দেওয়া হইত। অন্য নামাযের জন্য দেওয়া হইত না। হিজরতের পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান শুরু হয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। [উপটীকা শেষ]

তৃতীয় বিষয় ঃ সীরাতে ইবনে হিশামে যেই দুই বণিক দলের উল্লেখ রহিয়াছে, প্রকাশ্যতঃ তাহারা পৃথক পৃথক দুইটি বণিক দল ছিল। বাইহাকীর হাদীসে যেই বণিক দলের সম্বন্ধে {বুধবার সন্ধ্যার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত} না পৌছিবার বর্ণনা রহিয়াছে, মনে হয় তাহারা পৃথকভাবে আর একটি বণিক দল হইবে। কেননা সীরাতে ইব্‌নে হিশামে বর্ণিত উপরোক্ত দুইটি বণিক দলের মধ্য হইতে এক দল বণিক মক্কায় আসিয়া পৌছিয়াছে এবং দ্বিতীয় বণিক দলের সহিত আগমনের সময় "তানঈমে" সাক্ষাত হইয়া গিয়াছে। {১}

মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া বিনা সূত্রে উপরোল্লিখিত উভয় ঘটনা অর্থাৎ উট ভাগিয়া যাওয়া ও মাটিয়া রংয়ের উট সকলের সামনে থাকার বর্ণনাকে একই বণিক দলের দুই ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। {এই সকল বর্ণনাবলীর দিকে গবেষণার চোখে লক্ষ্য করিলে} ঐ কথাই বিশেষভাবে পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, বর্ণিত তিন বণিক দল আসলে এক বণিক দলেরই তিন অংশ। অর্থাৎ তাহারা তিন দলে বিভক্ত ছিল। {২}

উপটীকা ঃ {১- ক} তাহা হইলে মি'রাজ রজনীতে দর্শনপ্রাপ্ত বণিক দলের সংখ্যা সর্বমোট তিনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

{১-খ} আমার মতে এইখানে আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে যে, বাইহাকী শরীফে বর্ণিত দল তৃতীয় বণিক দল নহে, বরং ইহারা সীরাতে ইবনে হিশামের উল্লিখিত দুই বণিক দলের মধ্য হইতে ঐ বণিক দল, যাহারা মক্কায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। কেননা অত্র গ্রন্থে শুধু মক্কায় বণিক দল পৌছিবার বর্ণনা রহিয়াছে ; কোন্ দিন বা কোন্ সময়ে পৌছিয়াছে– সোমবারে বা বুধবারে, সকালে বা বিকালে ইত্যাদি কোন কিছুই বলা হয় নাই। তাই সর্বাধিক ধারণা, ইহারাই ঐ বণিক দল, যাহাদের আগমন সম্বন্ধে বাইহাকীতে বুধবার সন্ধ্যার কথা উল্লেখ হইয়াছে। যদি এই ব্যাখ্যাই ঠিক হয়, তাহা হইলে বণিক দলের সংখ্যা দুই। আল্লাহ সর্ববিষয় জ্ঞাত।

{২} মাওয়াহিবের সহিত অন্যান্য বর্ণনায় যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল তাহা এই বাক্য দ্বারা দূরীভূত হইয়া গেল। **[উপটীকা শেষ]**

অতএব প্রথম দিকের উভয় ঘটনা প্রথমে বর্ণিত দুই দলের সহিত ঘটিয়াছিল। আর তৃতীয় ঘটনা অর্থাৎ সময়মত না পৌঁছা এবং সূর্য অস্ত বন্ধ রাখার বর্ণনা তৃতীয় দলের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বণিক দলের সকল জনতা একই দলের কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল। এই জন্যই দুইটি ঘটনাকে একই বণিক দলের ঘটনা বলিয়া দেওয়াও ছহীহ হইয়াছে।

সূর্য অস্ত বন্ধ রাখার ব্যাপারে কোন প্রকারের যুক্তিগত সমস্যা নাই। {কারণ ইহা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মু'জিযা, নবীর পক্ষে এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা মু'জিযা হিসাবে খুবই সম্ভব।} এই জন্য উক্ত মু'জিযাকে অস্বীকার করার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

এমন একটি মহা অলৌকিক ঘটনা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হওয়ার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহা অল্প সময়ের জন্য হইয়াছিল, এতটুকু সময়ের মধ্যে কেহই উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

হুজুর মি'রাজ হইতে ফিরিয়া আসার সময় "বোরাকে ছিলেন না আর অন্য কিসে ছিলেন;" এই বিষয় আমি (থানভী) অনেক খোঁজ করার পরেও জানিতে পারিলাম না। যদি কেহ উক্ত বিষয়ে অবগত হইতে পারেন তাহা হইলে এই স্থানে টীকার চিহ্ন দিয়া উহা লিখিয়া দিবেন। (১)

টীকা ঃ (১) ইহার কিছু দিন পর আমার {থানভীর} বন্ধু ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক বরধোয়ানী সাহেব চিঠির মাধ্যমে এই বিষয়ে আমাকে {থানভীকে} জানাইলেন যে,

حيوة الحيوان للكمال الدميرى ذكر البراق صفحه-

١٠٧ ج - ١

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা ঃ

কামালুদ্দামীরীর রচিত "হায়াতুল হাইওয়ান" কিতাবের ১ম খন্ডের ১০৭ পৃষ্ঠার বোরাক অধ্যায়ে লিখিত রহিয়াছে ঃ

ان قيل لم عرج البراق به صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه اظهار القدرة الله تعالى- وقيل دل بالصعود على النزول كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر يعنى والبروه كقوله تعالى بيدك الخير اى والشر وقال حذيفة مازايل ظهر البراق حتى روج او مافى المكتوب-

–এই বর্ণনার সারমর্ম দুই ধরনের দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ ইহাতে তারাদ্দুদ ও পেরেশানী প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ হোযাইফার বর্ণনা দ্বারা বোরাককে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই হোযাইফার সনদ সূত্র জানা যায় নাই। তবে কামালুদ্দামীরীর মত একজন বিশেষজ্ঞ মুহাক্কেকের বর্ণনা সীরাত ও ইতিহাসের জন্য যথেষ্ট।
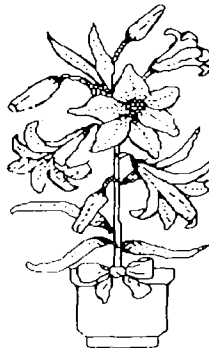
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রোতাদের অবস্থা

মি'রাজ ঘটনাবলী শ্রবণ করার পর শ্রোতাদের অবস্থা তথা গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের বিবরণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে রাতারাতি মসজিদে আকসায় লইয়া গিয়াছিল (এই বাক্যে মসজিদে আক্‌সা হইতে সামনের দিকে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয় নাই)। প্রভাতে তিনি উক্ত ঘটনা মানুষের নিকট ফরমাইলেন। ইহাতে কোন কোন মুসলমান মুরতাদ হইয়া গেল, ঈমান হারাইয়া কাফির বনিয়া গেল। মুশরিকদের একদল হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট দৌড়াইয়া যাইয়া বলিতে লাগিল, আপনার বন্ধুর কি কোন খবর রাখেন? তিনি বলিতেছেন, আমাকে রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়া গিয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি কি সত্যই এইরূপ বলিতেছেন? লোকেরা বলিল, হাঁ। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সত্যই বলিয়াছেন।

মুশরিকরা বলিল, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছেন আবার প্রভাত হওয়ার পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছেন। আপনি কি ইহাও বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছেন? (অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস বহুদূরে অবস্থিত)। আবু বকর (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমি ইহা হইতে অধিক বড় বিষয়েও তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। অর্থাৎ আসমানী সংবাদ {ওহী} সম্বন্ধে, যাহা সকাল বা সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে, (যাহা সময়ের তুলনায় মি'রাজ রাত্র হইতে অনেক কম।) আমি বিনা দ্বিধায় উহা বিশ্বাস করিয়া থাকি।

বস্তুতঃ এই জন্যই তাঁহার নাম ছিদ্দীক রাখা হইয়াছে।

—(হাকিমের মুস্তাদরাক ও ইব্নে ইসহাক)

ব্যাখ্যা ঃ ইহা দ্বারাও সুপ্রমাণিত হইতেছে যে, মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হইয়াছিল। যদি তাহাই না হইত এবং হুজুর যদি নিদ্রাবস্থার কথা বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে ইহা মানুষের জন্য বিশ্বাস করা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না এবং ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া কিছু লোক মুরতাদও হইত না।
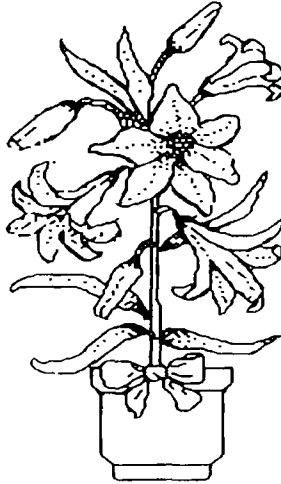
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মি'রাজের দলীল

কাফিরদের পক্ষ হইতে দলীল তলব এবং সাইয়েদুল আবরার আলাইহি ছালাতুল্লাহিল আজিজিল গাফফারের তরফ হইতে জওয়াব দানের বর্ণনা ঃ

১-হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি হাতীমের মধ্যে ছিলাম, এই সময় কুরাইশরা আমার মি'রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। তাহারা বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে এমন কতগুলি প্রশ্ন করিয়া বসিল, যাহা আমি (দরকার হইবে না মনে করিয়া) মুখস্থ করিয়া রাখি নাই।{১} সুতরাং আমার এমন অসুবিধা লাগিতেছিল, যাহা আর কখনও লাগে নাই। অনন্তর আল্লাহ তাআলা উহা {বাইতুল মুকাদ্দাস} আমার জন্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। আমি উহাকে দেখিতেছিলাম এবং তাহারা আমাকে যে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমি তাহার জওয়াব দিতে লাগিলাম।-(মুসলিম, মিশকাত)

২-হাদীস ঃ আহমাদ ও বায্যার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর ফরমান, বাইতুল মুকাদ্দাস আকীলের ঘরের পাশে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি উহাকে দেখিয়া দেখিয়া সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম এবং এক নজরে উহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম।

৩-হাদীস ঃ ইবনে সা'দ উম্মে হানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর ফরমান, আমার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস ছবি আকারে দেখান হইল, আমি লোকদেরকে উহার সমস্ত গঠন নমুনা বলিয়া দিলাম।

উপটীকা ঃ {১} ইহাতে বুঝা গেল, গায়েবের সব কথা হুজুরের জানা ছিল না।

উম্মে হানীর এই হাদীসে আরও রহিয়াছে যে, লোকেরা তাঁহাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজার সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। হুজুর (সাঃ) ফরমান, (নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া) আমি তখন দরজাগুলির সংখ্যা গনিয়া রাখি নাই। আর এখন {লোকেরা জিজ্ঞাসা করার পর আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রকাশ হইয়া গেল এবং} আমি উহাকে দেখিয়া দেখিয়া এক একটা করিয়া দরজা গণনা করিয়া দিতে লাগিলাম।

৪-হাদীস ঃ আবু ইয়ালার বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই প্রশ্নকারী মুতয়েম ইবনে আদী ছিল। যে লোকটি জুবাইর বিন মুতয়েমের পিতা হইত।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারাও পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, এই মি'রাজ ভ্রমণ সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছিল। নচেৎ এই সকল প্রশ্নের উদ্রেকই হইত না এবং বিরোধিতা করারও কোন কারণ ছিল না। আর উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপের আবশ্যকতাও রাখে না।

৫-হাদীস ঃ আর একটি হাদীসে রহিয়াছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস সম্বন্ধে হুজুরের দরবারে আরজ করিয়া বলিলেন, "হুজুর! আমি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছি এবং উহাকে ভালভাবে দেখিয়াছি। {"কিন্তু আপনি কোন দিন সেইখানে যান নাই এবং উহাকে দুই চোখে কখনও অবলোকন করেন নাই। সেই জন্য উহার বিস্তারিত বর্ণনা বলিয়া দেওয়া সাধারণভাবে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপনার পক্ষে সম্ভব নহে, তারপরেও যখন বলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাহা হইলে ইহা আপনার একটি মহা মু'জিযা হিসাবে গণ্য হইবে, আর আপনি যে মহা সত্য নবী, তাহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণরূপে ইহা দলীল হইয়া থাকিবে।" মনে হয় ইহা ছিল আবু বকরের (রাঃ) প্রশ্ন করার আর একটি উদ্দেশ্য।} অতএব আপনি বলুন! নবী পাক (সঃ) বলিতে আরম্ভ করিলেন আর হযরত আবু বকর (রাঃ) সত্য সত্য বলিয়া

'তাছদীক' করিতে লাগিলেন এবং প্রতিটি কথা চরম সত্য হিসাবে স্বীকার করিলেন ও মানিয়া লইলেন। হুজুর ফরমাইলেন, হে আবু বকর! আপনি 'ছিদ্দীক'! অর্থাৎ সত্যকে সত্য হিসাবে গ্রহণকারী, মহা- সত্যবাদী।

—(সীরাতে ইবনে হিশাম) {১}

উপটীকা ঃ {১} মি'রাজের দলীল হিসাবে নিম্নলিখিত আর একটি ঘটনা এ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা খুবই সমীচীন মনে হইতেছে। আবু নুয়াঈম ইছফাহানী তাঁহার দালায়েলুন নবুয়াত কিতাবে রোম সম্রাট হেরাক্লের দরবারে সংঘটিত আবু সুফিয়ানের একটি বিরাট ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ঘটনার শেষের দিকে বর্ণিত হইয়াছে—

আবু সুফিয়ান বলেন, রোম সম্রাট হেরাক্লের প্রশ্নের উত্তরে আমি বিখ্যাত মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদাহানিকর কোন কথা বলিতে সাহস করি নাই।

অবশেষে আমি তাঁহার নিকট মি'রাজ রাত্রে হুজুরের বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করার ঘটনা বর্ণনা করণার্থে বলিলাম, "হে বাদশাহ! এখন আমি আপনার নিকট এই নবীর এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করিব, যাহা শুনামাত্র আপনিও তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে বাধ্য হইবেন।" বাদশাহ্ প্রশ্ন করিলেন, "সে বিষয়টি কি?" উত্তরে আবু সুফিয়ান বলিলেন, সেই নবী দাবী করিয়াছেন যে, এক রাত্রে আমাদের মক্কা শহর হইতে তিনি বাহির হইয়া বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে পৌঁছিয়াছেন। আবার সেই রাত্রেই নাকি প্রভাত হওয়ার আগে মক্কা শহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া রোম সম্রাটের উত্তর দেওয়ার পূর্বেই বাইতুল মুকাদ্দাসের পোপ—পাদরী, যিনি পূর্ব হইতে বাদশাহর নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, সম্রাট! "আমি নিজেই উক্ত রাত্রের এই ঘটনা সম্বন্ধে

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

অবগত আছি।'' বাদশাহ্ পাদরীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ''আপনি এই ঘটনা কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন?'' উত্তরে পাদরী বলিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস মাসজিদের দ্বারসমূহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত। প্রত্যহ আমি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে উক্ত দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া শয়ন করি। সেই রাতেও আমি পূর্বের ন্যায় মাসজিদের সকল দ্বার বন্ধ করিলাম, কিন্তু একটি দ্বার বন্ধ করিতে পারিলাম না। মাসজিদের সেবক ও অন্যদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমরা সকলে মিলিয়া উক্ত দরজা বন্ধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও নাড়াইতে পারিলাম না। উহা পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ছিল। অতঃপর দরজা ঠিক করার জন্য কাঠমিস্ত্রীকে ডাকিয়া আনা হইলে সব কিছু দেখিয়া তিনি বলিলেন, ''দ্বারটির উপরের দিকের চৌকাঠ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য এই রাত্রে দরজা ঠিক করা সম্ভব হইবে না। আগামীকাল আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, উহার কি হইয়াছে?

পাদরী বলিলেন, অতঃপর আমি উক্ত দ্বার খোলা রাখিয়াই নিদ্রা যাওয়ার জন্য চলিয়া আসিলাম। রাত্র প্রভাত হওয়ার পর আমি উক্ত দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উহা পূর্বের ন্যায় ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং মসজিদের কোণে ছিদ্রযুক্ত পাথরটি খোলা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ ঐ ছিদ্রটি এত দিন বন্ধ ছিল। এমনকি উক্ত পাথরের সহিত সাওয়ারী বাঁধার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া আমার সঙ্গীগণকে বলিলাম, বোধহয় পূর্ব রাত্রে কোন নবীর আগমনের উদ্দেশে দ্বারটি অলৌকিকভাবে খোলা রাখা হইয়াছিল। উক্ত নবী এই রাত্রে মাসজিদে আসিয়াছেন এবং নামায পড়িয়া আবার চলিয়া গিয়াছেন।

–তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩, ২৪, বৈরুতে মুদ্রিত ১৩৮৮ হিঃ, ১৯৬৯ ইং। খাছায়েছুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭০, ১৭১. বৈরুতে মুদ্রিত, ১৩২০ হিঃ। [উপটীকা শেষ]

আবু বকরের এইরূপ জিজ্ঞাসার দ্বারা কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় নাই। কেননা তাঁহার প্রশ্ন সন্দেহ ও পরীক্ষামূলক ছিল না, বরং কাফিরদেরকে শুনাইয়া দেওয়াই মাকসূদ ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন। সেই জন্য কাফিররা এই বিষয়ে তাঁহার উপর দৃঢ় আস্থা রাখিত এবং ইহাও তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, আবু বকরের মত মহা সত্যবাদী ও সম্মানিত ব্যক্তি অনুভূতি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কোন কিছুই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না এবং সন্দেহের বস্তুকে সত্য হিসাবে মানিয়া নিবেন না।

কাফিররা হয়ত ঐ একই মজলিসে অথবা পৃথকভাবে অন্য মজলিসে প্রশ্ন করিয়াছিল। উভয় কথার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি একই মজলিসে প্রশ্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে কাফিররা যদি প্রশ্নকারী হয়, এমতাবস্থায় আবু বকর হইবেন প্রশ্নের সাহায্যকারী। আবার এর বিপরীতভাবেও হইতে পারে। অর্থাৎ যদি আবু বকর প্রশ্নকারী হন, তবে কাফিররা হইবে প্রশ্নের সাহায্যকারী।

বস্তুতঃ এখানে উভয়ের প্রশ্নের উদ্দেশ্য এক ছিল না। বাইতুল মুকাদ্দাস নিজস্ব জায়গায় থাকিয়া প্রকাশ পাওয়া কিংবা আকীলের বাড়ীর পাশে চলিয়া আশা অথবা উহার ছবি প্রতিফলিত হওয়ার মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য বোধহয় এই হইবে যে, উহার ছবি পরিস্ফুটিত হইয়া আকীলের বাড়ীর পাশে আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

যেমন– নাসায়ী শরীফের একটি হাদীসের মধ্যে রহিয়াছে, বেহেশত ও দোযখ ছবি আকারে হুজুরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ বাইতুল মুকাদ্দাস ও তাহার ছবির মধ্যে হুবহু মিল থাকার কারণে ছবির আগমনকেই বাইতুল মুকাদ্দাসের আগমন হিসাবে ফরমাইয়া দিয়াছেন।

উপরের ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ সমস্যাটিও চলিয়া গেল যে, "যদি প্রকৃতই বাইতুল মুকাদ্দাস এখানে আসিত এবং নিজ স্থান ছাড়িয়া এতক্ষণ পর্যন্ত

নিরুদ্দেশ থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা ইতিহাসে লেখা হয় নাই কেন?"

وهذا اخرما اردت ايراده فى هذه الخير-
ومضى الليل وبدء السحر-وصلى الله تعالى
على هذا النبى خير الخلائق والبشر وعلى
اله واصحابه مصابيح الغرر-(١)

টীকা ঃ (১) মি'রাজ সম্বন্ধে আরো তিনটি কাহিনী রহিয়াছে।

১। **প্রথম কাহিনী ঃ** হুজুর (সঃ) এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিলেন যাহারা তাহাদের নখ দ্বারা নিজেদের মুখ আঁচড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করার পর জানিতে পারিলেন, এই লোকগুলি পরনিন্দা গাহিয়া বেড়াইত।

২। **দ্বিতীয় কাহিনী ঃ** হুজুরের উম্মাতের উদ্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করিয়াছেন।

৩। **তৃতীয় কাহিনী ঃ** ফেরেশতাগণ নবী পাকের নিকটে নিবেদন করিলেন যে, আপনি আপনার উম্মাতদিগকে শিঙ্গা লাগাইয়া চিকিৎসা করার {অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে কিছু রক্ত বাহির করার ও অস্ত্রোপচার করার} পরামর্শ দান করিতে মর্জি করিবেন।

এই টীকা লেখার সময় পর্যন্ত এই সকল হাদীস আমার {থানভীর} হস্তগত হয় নাই। কাহারো নজরে পড়িলে টীকা হিসাবে লিখিয়া দিবেন।

টীকার টীকা ঃ উপরোল্লিখিত হাদীসগুলি সম্মুখে দেওয়া হইল–

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকার টীকা ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

اَخْرَجَ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدُ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمَشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاَءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاَءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ الدُّرُّ الْمَنْثُوْرِ فِىْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ بِالْمَاثُوْرِ مَطْبُوْعَةِ مِصْرٍ جِلْدِ رَابِعِ صَفْحَه- ١٥٠

– আহমাদ ও আবু দাউদ আবদুর রাহমান বিন জুবাইরের মাধ্যমে হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন আমাকে উর্ধ্বে উঠান হইয়াছিল, তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম, যাহাদের নখগুলি তামার ছিল। উক্ত নখ দ্বারা তাহারা আপন মুখ ও বক্ষ চাঁছিয়া ফেলিতেছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে বলিলাম, ইহারা কোন্ দল? জিবরাঈল বলিলেন, ইহারা মানুষের গোশ্ত খাইত। অর্থাৎ 'গীবত' গাহিয়া বেড়াইত এবং মানুষের মর্যাদাহানিকর কার্যে লিপ্ত থাকিত।

–দোররুল মানসুর ফী তাফসীরিল কুরআন বিলমাছুর, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১৫০, মিসরে মুদ্রিত।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকার টীকা

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

اَخْرَجَ التِّرْمِذِىُّ وَحَسَنَهُ وَابْنُ مَرْدُوِيَّه مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اَسْرٰى بِىْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ وَاَنْ اَخْبِرْهُمْ بِاَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عُذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِىْ مُعْجِزَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفْحَه - ٣٥٥

–তিরমিযী ও ইবনে মারদুবিয়াহ আবদুর রাহমানের সূত্র দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে হযরত ইব্রাহীমের সাথে আমার সাক্ষাত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ হইতে আপনার উম্মাতদিগকে সালাম দিবেন এবং তাহাদিগকে এই কথার সুসংবাদ জানাইয়া দিবেন যে, বেহেশ্ত পবিত্র মাটির স্থান এবং মরু মাঠ {বৃক্ষ-লতাবিহীন অবস্থায় বিরাট এলাকা খালি পড়িয়া রহিয়াছে।} একমাত্র "সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" তাসবীহ দ্বারা উক্ত মাঠে বৃক্ষ উৎপন্ন করা সম্ভব। – হুজ্জাতুল্লাহি আলালআলামীন, ফী মু'জিযাতি সাইয়িদিল মুরসালীন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। –পৃষ্ঠা ৩৫৫

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকার টীকা ঃ

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ اَسْرٰى بِهٖ اَنَّهٗ لَمْ يَمُرَّ مَلَاءٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَّا اَمَرُوْهُ مُرْاُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ وَابْنِ مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ (مِشْكٰوةُ الْمَصَابِيْحِ كِتَابُ الطِّبِّ وَالرَّقى-صفحه-٣٩) لبعض الافاضل ١٢ منه {مظا هر حق جلد ٤ صفحه-١٠}

– হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মি'রাজ রজনীর একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই রজনীতে তিনি ভ্রমণ করিয়া যাওয়ার সময় যেকোন ফেরেশতা দলের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইত, তখন তাহারা আরজ করিত, হে আল্লাহ্‌র হাবীব! আপনি আপনার উম্মাতদিগকে হাজামাত– শিঙ্গা লাগাইবার, রক্ত বাহির করার {ও বিভিন্ন রোগে অস্ত্রোপচার করার হুকুম} দান করিবেন। {১}

–তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাতের কিতাবুত তিব্ব অররাকী অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৯ {মাজাহিরে হক, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০} [টীকার টীকা শেষ]

উপটীকা ঃ {১} চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ মনে হয়, মি'রাজ রজনীতে যেইরূপভাবে হুজুর নামাযের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঠিক তদ্রূপ চিকিৎসার জন্য অস্ত্র ব্যবহারের {এবং টীকা ও ইনজেকশন দেওয়ার} আদেশও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মি'রাজ অধ্যায়ের আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা

মি'রাজ অধ্যায় যেহেতু অন্যান্য সকল অধ্যায় হইতে সর্বাধিক আজীমুশ্শান, মহাগুরুত্বপূর্ণ ও চরম মর্যাদার অধিকারী। সেই জন্য অন্যান্য অধ্যায়ের বিপরীত (ঐ সকল অধ্যায়ের ব্যাখ্যা হাদীসের টীকায় লেখা হইয়াছে।) এই অধ্যায়ের কোন কোন ব্যাখ্যা টীকায় না লেখিয়া বিষয় বর্ণনার মূল পাঠের সহিত এক সঙ্গে লেখিয়া দেওয়া ভাল মনে হইতেছে। তবে সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যা দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রথম প্রকার ঃ 'হুকমিয়া,' যাহার উপাধি 'বাবুল আনোয়ার' দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ 'হিকমিয়া,' যাহাকে 'বাবুল আসরার' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। প্রথম প্রকারকে আমালিয়াত এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ইলমিয়াত বলা হয়।

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট উপটীকা ঃ

তবে শুধু পার্থক্য এই ছিল যে, নামাযের হুকুম সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়াছেন। আর অস্ত্র ব্যবহারের হুকুম ফেরেশতা দ্বারা প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অবগত।

বোধহয় সেই জন্য নামায সকলের উপর ফরয, আর অস্ত্র ব্যবহার ফরয নহে। নামায সকলে জানে, বুঝে ও পারে, পক্ষান্তরে অস্ত্র ব্যবহার সকলে জানে না, পারে না। নামায না পড়িলে উহার জন্য জওয়াবদিহি করিতে হইবে। বেহেশতে যাওয়া মহা মুশকিল হইয়া দাঁড়াইবে। নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ অস্ত্র ব্যবহার না করিলে দোযখে যাইবে না। মনে হয়, ইত্যাদি পার্থক্য বুঝাইবার জন্য নামাযের আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়াছেন। আল্লাহই সব জানেন। [উপটীকা শেষ]

আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যার প্রথম প্রকার

হুকমিয়া বা আমাল করার ব্যাখ্যা

নং ১– মি'রাজ হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে, হুজুর (সঃ)–এর বক্ষ মুবারাক বিদীর্ণ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এক পুরুষ অন্য পুরুষের বক্ষ দর্শন করা বৈধ বলিয়া প্রমাণিত হইল। যদিও ফেরেশতাগণ নর-নারী হইতে পবিত্র, কিন্তু শরীয়াতের পরিভাষায় তাঁহাদিগকে পুরুষ হিসাবেই ধরা হয়। এই কারণেই তাঁহাদিগকে পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়া বক্ষ অবলোকনের উল্লিখিত মাসআলা বাহির করা সমুচিত হইয়াছে।

নং ২– হাদীসে ইহাও বর্ণিত আছে, বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছার পর হালকার– পাথরের গোলাকার ছিদ্রের সহিত বোরাক বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। দৈনন্দিন কাজ-কামে আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস রাখিয়া অন্য কোন সাবধানতা অবলম্বন করিলে উহা দ্বারা তাওয়াক্কুল করার বা আল্লাহর উপর ভরসা রাখার কোন বিরোধ ঘটে না, ইহাই এই হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত হইল। তবে আল্লাহর উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

নং ৩– মি'রাজ হাদীসের বর্ণনায় এই কথাটিও পরিলক্ষিত হইতেছে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যখন আসমানসমূহের দ্বারে পৌছিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কে? উত্তরে তিনি নিজের নাম "জিবরাঈল" বলিয়া জওয়াব দিলেন। 'আমি' শব্দ বলিলেন না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ধরনের প্রশ্নকারীর উত্তরে আমি না বলিয়া নিজের নাম বলাই আদাবের মধ্যে গণ্য। কেননা শুধু আমি বলা অনেক সময় পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট হয় না। {কখনও পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে হয়।} এমনকি এক হাদীসে 'আমি' বলিয়া জওয়াব দেওয়াকে অস্বীকারের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

নং ৪– ইহাতে একটি মাসআলাও ছাবিত– সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, কেহ কাহারো ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ। যদিও সেই ঘর কোন পুরুষেরই হউক না কেন।

নং ৫– উক্ত হাদীসে ইহাও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল মা'মুরের সহিত কোমর লাগাইয়া বসিয়া ছিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কিবলার সহিত কোমর লাগান এবং কিবলাকে পিঠ দিয়া বসা জায়েয। তবে আমাদের জন্য বিনা দরকারে এইরূপ না করাই আদাবের কাজ।

নং ৬– উক্ত হাদীসে ইহাও আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম ডান দিকে তাকাইয়া হাসিতেন এবং বাম দিকে তাকাইয়া কাঁদিতেন। ইহাতে সন্তানের প্রতি পিতার যে স্নেহ-মমতা রহিয়াছে, উহাই পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। যেহেতু তিনি সন্তানের সুখে আনন্দিত হইয়াছেন এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন।

নং ৭– এই একই হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কম সংখ্যক উম্মাত বেহেশতে যাইবে, হুজুর পাকের অধিক সংখ্যক উম্মাত বেহেশতে যাইবে।

এই কারণে হযরত মূসা (আঃ) কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার এই ক্রন্দন করা স্বীয় উম্মাতের প্রতি পরিতাপ ও আফসুসমূলক ছিল। আর আমাদের পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মাতের আধিক্যের প্রতি ইহা ছিল গিবতা। ইহাতে প্রমাণিত হইল, কল্যাণ কার্যে ও সৎ কাজে গিবতা {অর্থাৎ সেইরূপ হওয়ার আশা রাখা এবং অনুরূপ কাজের ক্ষমতা অর্জনের সংকল্প} করা প্রশংসনীয়। অপরের নিয়ামাত ও কল্যাণ বা কোন সম্পদ দেখিয়া এই আশা করা, যদি এই ধরনের নিয়ামাত আমার নিকটও হইত; {যদি আমিও এইরূপ সম্পদের মালিক হইতাম,} ইহাকে গিবতা বলে।

গিবতার মধ্যে অপরের কোন ক্ষতির কামনা থাকিবে না এবং অন্যের নিয়ামার্ত ও ধনসম্পদ ধ্বংসের কামনা করিবে না। নচেৎ ইহা হাসাদ– হিংসার মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। আর হিংসা করা হারাম।

–(নববী– শারহে মুসলিম)

নববীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াও আরো কিছু উপকারী ব্যাখ্যা যাহা আমার {থানভীর} স্মরণে আসিয়াছে লিখিয়া দিতেছি

নং ৮– মি'রাজ ঘটনায় ইহাও রহিয়াছে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হুজুর (সঃ)–এর রিকাব এবং হযরত মিকাঈল আলাইহিস্ সালাম লাগাম ধারণ করিয়াছিলেন। উহাতে প্রমাণিত হইল, আরোহী যদি বিশেষ কোন কারণে নিজের খাদেমদের নিকট হইতে এইরূপ কোন কার্য করাইয়া নেন, অথবা কোন প্রেমিক যদি সম্মান ও মহব্বত করার উদ্দেশে এই প্রকারের কোন খেদমত করেন, তাহা হইলে উহাকে বৈধ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তবে হাঁ, অহংকার না থাকা চাই।

নং ৯– উক্ত হাদীসে ইহাও রহিয়াছে, হুজুর (সঃ) পথে কোন কোন কল্যাণ ও বারকাতের স্থানে নামায পড়িয়াছিলেন। উহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বুজুর্গ ও সম্মানিত স্থানে নামায পড়া মঙ্গলজনক। তবে ইহা এই শর্তের উপর হইতে হইবে যে, ঐ স্থানে নামায পড়া সৃষ্টি জগতের কাহাকেও যেন ভক্তি করা (বা পূজা করার) উদ্দেশে না হয়। ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া নিন। বড় সূক্ষ্ম কথা।

নং ১০– হাদীসে ইহাও আছে, রাস্তার মধ্যে হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম প্রমুখ নবীগণ হুজুর আকদাস (সঃ)–কে সালাম দিয়াছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইহার বর্ণনা চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, আরোহী ও পথিক যদি কোন বসা বা দন্ডায়মান ব্যক্তিকে না দেখার কারণে সালাম না করে, তাহা হইলে বসা ও দন্ডায়মান ব্যক্তিগণ আরোহী ও পথিককে সালাম দেওয়া উত্তম {১}

নং ১১– হাদীসে ইহাও আছে, হুজুর (সঃ) কতিপয় মানুষকে তাহাদের কোন কোন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রাপ্তাবস্থায় দেখিয়াছেন, ইহা দ্বারা সেই নেক বা বদ আমলের প্রতিফল পাওয়া সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হইয়া গেল, এই বিষয় বুঝাইয়া দেওয়ার আর অবকাশ রাখে না।

নং ১২– হুজুর (সাঃ) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সুন্নাত হিসাবে প্রমাণিত হইল।{২}

উপটীকা ঃ {১} এইখানে ইহাও হওয়ার অবকাশ রাখে যে, প্রিয় নূর নবী (সঃ) তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ হিকমাতের কারণে সালাম দেন নাই। সেই হিকমাত এই হইতেছে যে, {ক} আরোহী ও পথিকরা, বসা বা দন্ডায়মানদেরকে প্রথমে সালাম না দিলে, গুনাহ হইবে না। {খ} বসা বা দাঁড়ানো লোকেরা অন্য কাজে বিশেষভাবে মাশগুল থাকিলে তাহাদিগকে সালাম না দেওয়া উত্তম। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

{২} মি'রাজ রজনীতে হুজুর আক্দাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বেহেশতের মধ্যে হযরত বিলালের জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন। যেহেতু তিনি তাহিয়্যাতুল অজু নামায পড়িতেন। –(মিশকাত, পৃষ্ঠা ১১৬)

মি'রাজ ঘটনার এই হাদীস দ্বারা তাহিয়্যাতুল অজু নামায সুন্নাতে গণ্য হইল এবং ছাওয়াবের কথাও জানা গেল। **[উপটীকা শেষ]**

নং ১৩– বাইতুল মুকাদ্দাসে হুজুর (সঃ)-কে ইমাম বানান হইয়াছে, ইহাতে বুঝা গেল, জাতির উত্তম ব্যক্তি ইমামাতের জন্য উত্তম।

নং ১৪– মি'রাজ হাদীসে পাওয়া যায়, বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামগণ নিজ নিজ গুণ ও সম্মান ইজ্জতের বর্ণনা করতঃ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে আল্লাহর নিয়ামাত ও অনুগ্রহের বর্ণনা করা প্রশংসনীয়, ইহাই এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল।

নং ১৫– হুজুর (সঃ)–এর পানির পিপাসা অনুভব হওয়ায় তাঁহার সমীপে কয়েক প্রকারের পানীয় বস্তু আনা হইয়াছিল। ইহাতে জানা গেল, মেহমানের সম্মানার্থে কয়েক প্রকারের খাদ্য ও পানীয় পাত্র তাঁহার সামনে হাজির করা জায়েয আছে।

নং ১৬– পানীয় পাত্র এইরূপভাবে উপস্থিত করার প্রতি যদি গবেষণার চোখে তাকান যায়, তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝে আসে, ইহা পরীক্ষার জন্য ছিল, তবে ইহা দ্বারা আরো একটি মাসআলা বাহির হইয়া গেল যে, দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষা লওয়া। {ইন্টারভিউ নেওয়া ও দেওয়া উভয় কার্য} জায়েয আছে।

নং ১৭– মি'রাজ হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যে, ফেরেশতারা হুজুরের উভয় দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। যাহার বর্ণনা দশম পরিচ্ছেদে চলিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, যদি সম্মানের উদ্দেশে খাদেমগণ উভয় দিক ঘিরিয়া রাখে, তাহা হইলে উহা দূষণীয় নহে।

নং ১৮– উক্ত বর্ণনায় ইহাও আছে, হুজুর (সঃ) যখন আসমানসমূহে পৌছিয়াছিলেন তখন ফেরেশতা ও নবী আলাইহিমুস সালাম তাঁহাকে

মারহাবা– শাবাশ ও ধন্যবাদ বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা জানা গেল, মেহমানের সম্মান করা এবং আনন্দ প্রকাশ করা উত্তম। আর মহান মেহমান শুভাগমনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও বটে।

নং ১৯– উহাতে ইহাও রহিয়াছে, হুজুর (সঃ) আসমানসমূহে নবী আলাইহিমুস সালামদেরকে প্রথমে নিজেই সালাম দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, আগন্তুক বসা লোককে সালাম করিবেন। যদিও আগন্তুক অধিক সম্মানিত হন।

নং ২০– উহাতে ইহাও আছে, হুজুর (সঃ) অন্যান্য নবীগণের ফাযায়েল ও বুযুর্গী বর্ণনা করিয়া নিজের জন্য দোয়া করিয়াছেন। নৈকট্যের স্থানে যাইয়া দোয়া চাওয়া দ্বারা দোয়ার মহা ফাযীলাতের কথা উপলব্ধি করা গেল। {অর্থাৎ দোয়া একটি অতীব প্রয়োজনীয় আমাল, ইহার গুরুত্ব অপরিসীম, ফাযীলাত ও ছাওয়াব অত্যধিক। ইহাই বুঝে আসিয়াছে।}

নং ২১– উক্ত মি'রাজ হাদীসে ইহাও আছে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নামাযের সংখ্যা কমাইবার জন্য হুজুর (সঃ)-কে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা গেল, পরামর্শ দেওয়া আর পরস্পর কল্যাণ কামনা করা অতীব উত্তম। যদিও পরামর্শ দানকারী হইতে পরামর্শ গ্রহণকারী মর্যাদা ও সম্মানে বড় হন।

নং ২২– উহাতে ইহাও আছে, হুজুর (সঃ) সেই পরামর্শানুযায়ী আহকামুল হাকেমীনের দরবারে নামায কমাইবার দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে জানা গেল, কল্যাণকর পরামর্শ গ্রহণ করা প্রশংসনীয়।

নং ২৩– উহাতে ইহাও আছে, মি'রাজের এই কাহিনী মানুষের নিকট প্রকাশ না করার জন্য হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হুজুর (সঃ)-এর সমীপে

আরজ করিয়াছিলেন। উহার বর্ণনা ২৩ নং পরিচ্ছেদে রহিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা গেল, যেই কথা প্রকাশ করিলে গোলযোগ সৃষ্টি হইবে উহা প্রকাশ করিবে না, হযরত উম্মে হানীর নিষেধ কর্‌র এই পরামর্শের মূল লক্ষ্য ইহাই ছিল।

নং ২৪– হুজুর (সঃ)–এর জওয়াবদানের দ্বারা বুঝা গেল, এই বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। অর্থাৎ যেই বিষয় দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয় নহে, উহা প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যেই বিষয়ের মধ্যে ধর্মীয় প্রয়োজন রহিয়াছে, উহা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিতে থাকিবে, গোলযোগের কোন পরওয়া করিবে না।

নং ২৫– উক্ত মি'রাজ হাদীসে ইহাও আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে রাইতুল মুকাদ্দাসের অবস্থাবলী সম্বন্ধে আরজ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি আমি বিশ্বাস করি, তাহা হইলে কাফিররাও বিশ্বাস করিবে। ২৫ নং পরিচ্ছেদে উহার উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহা দ্বারা জানা গেল, সত্য ও মিথ্যার ধারক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের বিতর্কের সময় সত্যের সাহায্যার্থে {সত্য পক্ষের কেহ} শুধু কথার মাধ্যমে প্রকাশ্যতঃ সত্যের বিপক্ষে যাওয়া জায়েয আছে।

মি'রাজ ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত সর্বমোট এই পঁচিশ নম্বর সমাপ্ত হইল।

আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যার দ্বিতীয় প্রকার

হিক্‌মিয়া বা জ্ঞান গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

ইহাও পঁচিশ প্রকারে বিভক্ত। তাহার মধ্যে ১৫টি বিষয় সাবধানতা সম্বন্ধে, ৫টি তাহকীক সম্বন্ধে, আর বাকী ৫টি সমস্যা সমাধানকল্পে লেখা হইয়াছে। ইহার বর্ণনা সম্মুখে আসিতেছে।

কুরআন পাকের 'ইস্‌রা আয়াতের' তাফসীরের মধ্যে এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা লেখা হইয়াছে। যাহা আমার {থানভীর} নিজস্ব তাফসীর 'বয়ানুল কুরআন' হইতে এইখানে লওয়া হইয়াছে। উহাই এখন লেখা হইতেছে।

تفسير اية الاسراء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا - اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

–তিনি অতি পবিত্র জাত, যিনি আপন বান্দা মুহাম্মাদ (সঃ)-কে রাত্রি বেলায় মাসজিদে হারাম অর্থাৎ কা'বার মাসজিদ হইতে মাসজিদে আক্‌সা (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত লইয়া গেলেন, যাহার চতুর্দিক (শাম দেশ পর্যন্ত) আমি (দুনইয়াবী ও ধর্মীয়) বিভিন্ন বারকাতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। (ধর্মীয় বারকাত যথা– ঐখানে অনেক সংখ্যক নবীর মাযার রহিয়াছে। দুনইয়াবী যথা– ঐখানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষলতা, নদীনালা এবং ফসলাদিও

হইত। ফল কথা, মাসজিদে আক্সা পর্যন্ত অতি আশ্চর্যজনকভাবে এজন্যই নিয়া গিয়াছিলেন) যাহাতে তিনি আপন আশ্চর্যজনক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন তাঁহাকে (বান্দাকে) দেখাইতে পারেন, (যাহার মধ্যে কিছু ঐখানে সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন- এত দূরের পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা, সকল নবীগণের সহিত সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি। আর কিছু পরে ঘটিয়াছিল। যেমন- সাত আসমানে গমন ও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দর্শন করা।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মহা শ্রবণকারী ও প্রত্যক্ষকারী (কেননা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সমস্ত কথা ও অবস্থা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে এইভাবে সম্মানিত করিলেন ও আপন বানাইলেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এই স্থানে কতিপয় জ্ঞাতব্য, সূক্ষ্ম ও কঠিন সমস্যার সমাধান রহিয়াছে।

১। সোবহানা পবিত্রতা ও আশ্চর্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেননা এত দূরে লইয়া যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হওয়াতে ইহা আল্লাহ্ তাআলার অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক। এই জন্য সোবহানা শব্দ দ্বারা আয়াত আরম্ভ করা সমীচীন হইয়াছে। অতএব অধম (থানভী রাহঃ) অনুবাদ করিতেও আশ্চর্যজনক বাক্যটি প্রকাশ করিয়াছি এবং এতটুকু পথ বোরাকে আরোহণ করিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, যাহার প্রমাণ ছহীহ্ হাদীসে রহিয়াছে। বোরাকের চলন ক্ষমতা বিজলীর মত আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল।

২। মাসজিদে হারাম হইতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত লইয়া যাওয়াকে "ইসরা" বলে এবং তার পর আসমানের উপরে যাওয়াকে মি'রাজ বলে। আবার কোন কোন সময় উভয় শব্দ সমষ্টির উপরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। এখানে بِعَبْدِ শব্দ বলার দুইটি ফায়েদা দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ সম্মানিত হওয়া ও নৈকট্য লাভের প্রকাশ করা। দ্বিতীয়তঃ এই আশ্চর্যজনক মু'জিযা দ্বারা তাঁহাকে যেন কেহ আল্লাহ্ বলিয়া সন্দেহ করিতে না পারে।

৪। যদিও اِسْرَاء রাতের ভ্রমণকেই বলা হয়, তবুও لَيْلًا শব্দ সংযোজিত করিয়া ভাষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাতের কিছু অংশ বুঝাইবার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা এবং অসীম ক্ষমতাবলে অল্প সময়ের মধ্যে এত লম্বা পথ অতিক্রম করা বুঝান হইয়াছে।

রূহুল মাআনীতে উক্ত বিষয় এইরূপে লিখিত রহিয়াছে যে, লাইল ও নাহার শব্দদ্বয়কে আলিফ্ লাম যুক্তরূপে ব্যবহার করিলে সারা দিন ও সারা রাত্রই কার্যকালরূপে পরিমিত হইয়া যায়। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই আয়াতে লাইলকে আলিফ্ লাম বিহীন নাকেরাহ্রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, মি'রাজের সফর সারা রাত্রব্যাপী হয় নাই, বরং উহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছিল।

৫। কখনও কখনও মাসজিদে হারামের অর্থ আসল মাসজিদ গৃহ ছাড়াও উহার গোটা এলাকার উপর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। {অর্থাৎ হারাম শরীফ অর্থ কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্মানিত স্থানকেও বুঝায়।} এইখানে দুই অর্থই সঠিক হইতে পারে। কেননা কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, তিনি উক্ত সময় হাতীমের মধ্যে ছিলেন। আবার কোন কোন হাদীসানুসারে তিনি উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। সুতরাং উক্ত আয়াত দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে এবং দুই হাদীসের মধ্যে মতবিরোধও এমন থাকে না। কেননা, হুজুর (সঃ) উম্মে হানীর ঘর হইতে হাতীমে আগমন করিয়া তৎপর মি'রাজে যাত্রা করিয়াছেন, ইহা মোটেই অসম্ভব নহে।

৬। মাসজিদে আকসাকে এই জন্য 'আকসা' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছিল যে, 'আকসার' অর্থ অনেক দূর। আর এই মাসজিদ মক্কা হইতে দূরে অবস্থিত।

৭। যদিও এইভাবে হুজুরকে না নিয়াও ঘরে রাখিয়াই আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দেখান সম্ভবপর ছিল, তথাপি বোরাকে আরোহণ করাইয়া এইভাবে ভ্রমণ করাইবার উদ্দেশ্য হইল, হুজুর পাকের সম্মান মর্যাদা ও উচ্চাসন প্রকাশ করা।

৮। রাতের ভ্রমণে এই বিশেষত্ব রহিয়াছে যে, সাধারণতঃ রাত্র হইল নিরালা ও নির্জন সময়। সুতরাং নিশীথকালে আহ্বান করার মধ্যে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হুজুর (সঃ) আল্লাহ্ তাআলার একান্ত খাস বন্ধু।

৯। এইখানে মাসজিদুল আক্সা বলিতে মাসজিদের যমীনকেই বুঝান হইয়াছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে যমীনটাই মাসজিদরূপে গণ্য। দালান বা ঘর তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহাকেও মাসজিদ বলা হয়। এই অর্থ গ্রহণ করার কারণ হইল, ইতিহাস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এবং হুজুর (সঃ)-এর মধ্যবর্তী যুগে ঐ মাসজিদের দালান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং উহা অনতিবিলম্বে قَضَيْنَا اِلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হইবে।

অতএব প্রকাশ্যভাবে একটা সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে যে, মাসজিদে আকসার অস্তিত্বই যখন ছিল না, তখন ঐ পর্যন্ত হুজুরকে নেওয়ার কী অর্থ হইতে পারে? সুতরাং মাসজিদের এই অর্থ ধরিয়া লইলে উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। আর যদি ঐ হাদীসের উপর সন্দেহ জাগে যে, কাফিরগণ বাইতুল মুকাদ্দাসের নমুনা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করিয়াছিল সে কথাগুলির অর্থ কী? তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ ইহাও হইতে পারে যে,

তাহারা সেই ভাঙ্গা দালানের নমুনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া ইহাও হইতে পারে যে, মাসজিদের যমীনের নিকট জনগণ কিছু দালানকোঠা বাইতুল মুকাদ্দাসের নাম অনুসারে বানাইয়াছিল। ঐ সকল দালান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল।

১০। আয়াতের মধ্যে اَلَّذِىْ بَارَكْنَا প্রশংসা হিসাবেই বাড়ান হইয়াছে এবং তা দ্বারা মাসজিদ যে বারকাতপূর্ণ তাহা প্রথমেই বুঝা গেল। কেননা তাহার আশেপাশের যমীনগুলি মাসজিদ না হওয়া সত্ত্বেও যখন বারকাতপূর্ণ বলা হইল, তখন মাসজিদ তো নিশ্চয়ই বারকাতপূর্ণ হইবে। কেননা আশেপাশে দুই প্রকারের বারকাত রহিয়াছে– (১) দুনইয়াবী ও (২) ধর্মীয়। ধর্মীয় বারকাত নিশ্চয় দুনইয়াবী বারকাতের ঊর্ধ্বে হইবে। ধর্মীয় বারকাত হইল তথায় নবীগণের মাযার রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা সশরীরে শুইয়া থাকার কারণে এই বারকাত শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর বাইতুল মুকাদ্দাস নবীগণের কেবলা হওয়ার কারণে এই বারকাতময় স্থান রূহের সহিত সম্পর্ক রাখে। ইহা সবচাইতে বড় বারকাত। বিশেষ করিয়া যখন তাঁহারা ঐখানে থাকিয়া ইবাদাত-বন্দেগী করিয়াছিলেন, তখন দেহ ও আত্মার মিশ্রণে উক্ত মাসজিদ বারকাত হইতে বারকাতপূর্ণ হইয়া গেল।

কোন কোন কিতাবে রহিয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীর মুবারাক যে মাটিতে শায়িত রহিয়াছে, সে স্থানটি আল্লাহর আরশ হইতেও উত্তম, উহাকে আংশিক মর্যাদা হিসাবে গণ্য করা উচিত। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

১১। আয়াতটির বাহ্যিক মর্মে যদিও হুজুর (সঃ)–এর মি'রাজ শুধু বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্তই হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু 'লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা' দ্বারা বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ বুঝিতে হইবে। আর ইহাও বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যমীনের নিদর্শন হইতে আসমানের নিদর্শনসমূহ অতি শ্রেষ্ঠ ও কামালাতপূর্ণ।

অতএব উক্ত আয়াতেই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের পরে তিনি আসমানেও আরোহণ করিয়াছিলেন। যেমন– মি'রাজের হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রহিয়াছে। এজন্যই তাফসীরে রূহুল মাআনীতে উহার উল্লেখ আছে।

لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا اَىْ لِنَرْفَعَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى يَرٰى مَا يَرٰى مِنَ الْعَجَائِبِ

অর্থাৎ আমার বান্দাকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করাইয়াছিলাম আসমানে আরোহণ করাইবার জন্য, যেন তিনি আমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ, যাহা কিছু দেখান হইবে, দেখিতে পারেন।

কিন্তু মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরের কথা যেমন স্পষ্টরূপে আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে, আসমানে আরোহণ করার ব্যাপারটি তদ্রূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত না হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আসমানে আরোহণ করার ব্যাপারটি অধিকতর বিস্ময়কর, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ কুরআনে বর্ণিত বিষয় বিশ্বাস না করিলে কাফির হইতে হয়। সুতরাং তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা না করিয়া দুর্বল ঈমানদারগণের প্রতি অনুগ্রহ করা হইয়াছে।

১২। আংশিক অর্থবোধক 'মিন' ব্যবহার করার ফলে বুঝা যায় যে, হুজুর (সঃ) সমস্ত নিদর্শন দেখিতে পান নাই। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তাহাই। কেননা ছহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, হুজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি মি'রাজে যাইয়া কলমের লেখার শব্দ শুনিয়াছি। ইহাতে প্রকাশ্যে বুঝা যায়, তিনি কলম দেখিতে পান নাই। এইরূপে হয়ত আরও অনেক কিছুই দেখিতে পারেন নাই।

১৩। 'আসরা' বাক্য আরম্ভ করিতে অনুপস্থিত লিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া আয়াতের শেষাংশেও অনুরূপ লিঙ্গবাচক শব্দ দ্বারা বাক্য শেষ করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে উপস্থিত লিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা মাহাত্ম্য এবং গুরুত্বের অর্থও বুঝায়। ইহার মধ্যে নিম্নোক্ত হিকমাতসমূহ নিহিত আছে–

(ক) একবার 'সে' আবার 'আমি' বলিয়া বাক্যের ধরন পরিবর্তনের দ্বারা শ্রোতাকে আনন্দ প্রদান করা।

(খ) যাহা কিছু দেখান হইবে তাহা অতীব আশ্চর্য ও বারকাতপূর্ণ এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা।

(গ) প্রথম 'আসরা' শব্দে অনুপস্থিত সম্বোধন করাতে ইঙ্গিতে বুঝা গেল যে, মি'রাজ ভ্রমণের পর তাঁহার নৈকট্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নৈকট্যের পরই আলাপের সময়।

(১৪) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ উক্ত আয়াতটি সর্বশেষে যোগ করার সার্থকতা তাফসীরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ব্যতীত এই সার্থকতাও হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা অবিশ্বাসীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের অবিশ্বাস এবং বিরোধিতা দেখিতেছি ও শুনিতেছি এবং ভালভাবেই শাস্তি দিব।

(১৫) এবং উক্ত আয়াতটি لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا –এর পরে বাড়ান দ্বারা একথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যদিও রাসূলুল্লাহ (সঃ) আশ্চর্য নিদর্শনসমূহ দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানে আমার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কেননা আমি তাঁহাকে দেখাইয়াছি আর আমি স্বয়ং দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। অর্থাৎ আমি না দেখাইলে তিনি দেখিতে পারেন না, আর কেহ না দেখাইলে শুনাইলেও আমি দেখি এবং শুনি। দ্বিতীয়তঃ তিনি কতিপয় নিদর্শন মাত্র দেখিয়াছেন, আর আমি ব্যাপকরূপে সব কিছুই শ্রবণ ও দর্শন করিয়া থাকি।

সূক্ষ্মালোচনা ঃ ১। এই আয়াতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত হুজুর (সঃ)-কে লইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। আর ভিতরে যাওয়ার কথা হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত আছে যে, তিনি মাসজিদে 'অ ক্সার' ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছেন এবং আম্বিয়া কিরামগণের সহিত তাঁহার াক্ষাত লাভের পর তিনি তাঁহাদের ইমাম হইয়া জামাআতে নামায আদায় করিয়াছেন।

২। মাসজিদে আকসায় উপস্থিতির পর আসমানসমূহে আরোহণ করার কথা এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝা গেলেও ইহাতে স্পষ্টরূপে উল্লেখ নাই। ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট রহিয়াছে সূরা 'আন্নাজমের' আয়াতে।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

অর্থাৎ তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দ্বিতীয় বার দেখিয়াছেন সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটবর্তী স্থানে।

আর প্রথম বার দেখা সম্বন্ধে وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। (উহা এই যে, জিবরাঈল (আঃ) হযরত (সঃ)-এর নিকট অধিকাংশ সময় দাহইয়াতুল কালবীর আকৃতিতে আসিতেন। হুজুর তাঁহার আসল আকৃতি দেখিতে চাহিলে জিবরাঈল বলিলেন, আপনি হেরা পর্বতে যাইয়া অপেক্ষা করুন, হুজুর তাহাই করিলেন এবং পূর্ব দিগন্তে দেখিতে পাইলেন, জিবরাঈলের ছয় শত ডানা এমনভাবে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে যে, পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

অতএব বুঝা যায়, হুজুর সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কেননা عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى কথাটি رَاٰى শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যিনি দেখিয়াছেন ও যাঁহাকে দেখিয়াছেন, উভয়েই সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটেই ছিলেন বলিয়া প্রকাশ্যে বুঝা যায়। এতদ্ব্যতীত আসমানে আরোহণের কথা হাদীসসমূহে এত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে যে, তাহা অবিশ্বাস করার উপায় নাই।

৩। আহলে সুন্নাত অলজামাআতের ওলামায়ে কিরামগণের অভিমত এই যে, হুজুর (সঃ)-এর মি'রাজ সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছিল, এই কথার প্রমাণ ওলামায়ে উম্মাতের (ইজমা) ঐকমত্য। তাঁহারা নিম্নোক্ত কারণসমূহ অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। যথা-

(ক) আল্লাহ তাআলা যেরূপ গুরুত্বের সহিত মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উহা অত্যধিক বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বুঝা যায়, কাজেই জাগ্রতাবস্থায় যে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অথবা এমন একটি ব্যাপার যদি স্বপ্নে বা আত্মিকভাবে হয় তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকে না। কেননা স্বপ্নে কিংবা আত্মিকরূপে সাধারণ লোক দ্বারাও বহু বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

(খ) আয়াতে بِعَبْدِهٖ শব্দ ব্যবহার করার কারণ বাহ্যতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, মি'রাজ সশরীরে হইয়াছিল। কেননা 'অমুকের গোলাম অমার নিকট আসিয়াছে' বলিলে বুঝিতে হইবে, গোলামটি জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে আমার নিকট আসিয়াছিল। কারণ গোলাম আসিয়াছে বলিতে জাগ্রতাবস্থায় আসাই বুঝায়, কিন্তু কোন সময়ে ইহার ব্যতিক্রম বুঝাইতে হইলে বাক্যের মধ্যে তাহা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(গ) যদি হুজুরের (সঃ) এই মি'রাজ স্বপ্নে কিংবা আত্মিক আকারে হইত, তবে ছহীহ হাদীস এবং বাইহাকীর বর্ণনানুসারে কাফিরগণ যখন উহা অবিশ্বাস করিয়াছিল, অথবা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস ও কাফেলার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন তিনি চিন্তামগ্ন না হইয়া সোজাসুজি বলিয়া দিতেন যে, আমার এই ঘটনা চোখের দেখা ব্যাপার বলিয়া তো আমি

তোমাদের নিকট দাবী করি নাই, যাহাতে তোমাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি দিয়া দিব? পরন্তু তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের আকৃতি ও অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন হইয়া গেলেন। বহু হাদীসে বর্ণিত আছে, হুজুর (সঃ) তাহাদের প্রশ্নে চিন্তিত হইলে আল্লাহ পাক বাইতুল মুকাদ্দাসের ছবি তাঁহার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন, তিনি তাহা দেখিয়া পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিলেন। –মুসলিম, আর কেহ কেহ আয়াতের মধ্যে رُؤْيَا শব্দ (যাহার অর্থ "স্বপ্ন দর্শন") দেখিয়া মনে করিয়াছেন, হুজুরের মি'রাজ স্বপ্নযোগে হইয়াছে। তদুত্তরে বলা যায়, উক্ত আয়াতে বদরের যুদ্ধ কিংবা হোদাইবিয়া সম্বন্ধীয় স্বপ্নের কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন– কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইহাই বলিয়াছেন, যাহা لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ এবং اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ الرُّؤْيَا তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। আর আয়াতটি যদি মি'রাজ সম্বন্ধেই ধরিয়া লওয়া হয়, তবে رُؤْيَا বলিতে স্বচক্ষে দেখাই উদ্দেশ্য হইবে। কেননা رَاٰى ক্রিয়ার মাছদার رُؤْيَةٌ এবং رُؤْيَا উভয় আকারেই প্রচলিত আছে। যেমন قَرُبَ ক্রিয়ার মাছদার قُرْبَةٌ এবং قُرْبٰى উভয় আকারেই হইয়া থাকে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারাও মি'রাজ সশরীরে হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। অথবা কাহারও মতে জাগ্রতাবস্থায় হইলেও রাত্রিকালের দর্শনকে رُؤْيَا বলা হয়, অথবা বিস্ময়কর বস্তু দেখিলে স্বপ্নবৎ মনে হয়, অথবা স্বপ্ন সাধারণতঃ রাত্রিকালে দৃষ্ট হয় এবং মি'রাজও রাত্রিকালেই হইয়াছিল। উক্ত সাদৃশ্যের দরুন رُؤْيَا শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু উহার শাব্দিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এই অর্থেও উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছিল। –(রূহুল মাআনী)

কেহ কেহ শরীকের হাদীসের শেষের অংশ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ (অর্থ- অতঃপর আমি জাগিয়া গেলাম) দ্বারা সন্দেহের মধ্যে উপনীত হইয়াছে, যেহেতু শরীক রাবী মুহাদ্দেসীনদের নিকট হাদীসের হাফিজ ছিলেন না এবং অন্য হাফিজগণের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাঁহার উক্ত অতিরিক্ত এবারত গ্রহণযোগ্য নয়। -(রূহুল মাআনী)

অথবা যদি গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্যও হয়, তাহা হুজুরের (সঃ) অপর মি'রাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

কেননা আলেমগণ লেখিয়াছেন, সশরীরে মি'রাজ হওয়ার পূর্বে হুজুরের (সঃ) আরও কয়েক বার রূহানী বা আত্মিক তথা স্বপ্নে মি'রাজ হইয়াছিল। এই মি'রাজের কারণ উক্ত আলিমগণ এই লেখিয়াছেন যে, প্রধান মি'রাজের যোগ্যতা এবং সহ্য করার শক্তি অর্জনের জন্যই পূর্বে স্বপ্নে কিংবা আত্মিকরূপে কয়েক বার মি'রাজ হইয়াছিল।

আবার কেহ কেহ হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত মাআবিয়ার (রাঃ) বর্ণনা দেখিয়া সন্দেহের মধ্যে উপনীত হইয়াছেন- বোধহয় মি'রাজ সশরীরে হয় নাই। তদুত্তরে বলা যায় যে, হুজুরের সহিত আয়েশার তখন পর্যন্ত বিবাহই হয় নাই এবং হযরত মাআবিয়া তখন পর্যন্ত ইসলামই গ্রহণ করেন নাই। হইতে পারে তাঁহারা কাহারো নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া অথবা নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী এইরূপ উক্তি করিয়া থাকিবেন। অথবা তাঁহাদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হইলেও তাহা অপর কোন মি'রাজ সম্বন্ধীয় উক্তি হইবে। আল্লাহ ভাল জানেন। অতএব তাঁহাদের উক্তির মধ্যে যখন নানা প্রকারের সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তাঁহাদের উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। {১}

টীকা ঃ {১} এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের তো আয়েশার এই বাক্যের ما فقد جسد محمد صلعم ليلة المعراج (অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রে হযরতের দেহ অন্তর্হিত বা নিরুদ্দেশ হয় নাই)-ইহার বিশ্লেষণ এইরূপ হইতে পারে।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা ঃ

যে- فقد শব্দের দুই অর্থ- ১। প্রথম অর্থ- কোন বস্তু নিজস্ব স্থান হইতে হারাইয়া যাওয়া, সরিয়া যাওয়া, ২। দ্বিতীয় অর্থ- অন্বেষণ করাও হয়। যেমন- সূরা ইউসুফের মধ্যে - قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون

অর্থাৎ ইউসুফের ভাইগণ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা কি বস্তু তালাশ করিতেছ?

এখানে فقد-এর অর্থ তালাশ করাই অধিক প্রকাশ্য। সুতরাং হযরত আয়েশার বাক্যের সারমর্ম এই যে, হুজুর (সঃ) মি'রাজ হইতে এত দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন যে, দেহ অদৃশ্য হওয়া সম্বন্ধে কেহ টেরই পায় নাই, যাহার ফলে হুজুরকে অন্বেষণের প্রয়োজন হইত। এই অর্থ নহে যে, সারা রাত্রের মধ্যে তাঁহার দেহ আপন ঘর হইতে কোথাও যায় নাই; শয়ন স্থানে রহিয়াছে। বরং সারমর্ম এই যে, ঘর হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এত বেশী সময় অনুপস্থিত ছিলেন না যাহাতে ঘরের লোকদের তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। {১} [টীকা শেষ]

টীকার টীকা ঃ {১}

আর যদি সে অর্থই ধরা হয়, অর্থাৎ হুজুরের দেহ ঘর হইতে অদৃশ্য হয় নাই, তবুও প্রমাণ হইবে না যে, মি'রাজ আত্মিক অথবা স্বপ্নযোগে হইয়াছে। কেননা فقدان শব্দের অর্থ স্বয়ং অদৃশ্য বা গায়েব হওয়া নহে, বরং হারাইয়া ফেলা বা দেখিতে না পাওয়া, যাহার জন্য একজন কর্তা ও একটি কর্মের প্রয়োজন। তখন অর্থ এইরূপ হইবে যে, সেই রাত্রে হুজুর (সঃ) সকলের সাথে নিদ্রা গিয়াছিলেন এবং মি'রাজ ঐ সময় হইয়াছিল, যখন গৃহবাসী নিদ্রায় মগ্ন, তাহাদের জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকার টীকা ঃ

আসিয়া সকলকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করিলেন। কিন্তু এমন হয় নাই যে, রাত্রে কেহ জাগিয়া হুজুর (সঃ)-কে দেখিতে পায় নাই, এতটুকু কথা অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজন ছিল।

فقدان এর অন্য অর্থ- অদৃশ্য করা, কিন্তু তাহা দুইভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক- অদৃশ্য করা, দুই- এমনভাবে অদৃশ্য করা যাহাতে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। প্রথমটা হইল فقد মতলক। দ্বিতীয় হইল فقد মোকাইয়াদ। সুতরাং এই হাদীসের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ ধরিতে হইবে। কেননা এত অল্প সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন যাহার খবরও লোকেরা পায় নাই এবং তাঁহাকে তালাশ করারও প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং আমার আগের ইবারাতের মধ্যে নিজ স্থান হইতে সরিয়া যাওয়া প্রথম অর্থে এবং তালাশ করা দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইবে। তাহা হইলে আভিধানিক অর্থেরও বিরোধিতা করা হইল না। তাছাউফের কায়দায় এটাও সম্ভবপর যে, উনসুরী দেহ আসমানে পৌঁছিয়াছে, আর মেছালী দেহ দুনইয়াতে রহিয়াছে এবং তাহাকে দেখিয়া দর্শক বলিয়া দিল- তাঁহার দেহ মুবারাক গায়েব হয় নাই। যেমন- হুজুর আকরাম (সঃ) আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণকে দেহসহকারে বাইতুল মুকাদ্দাসেও দেখিয়াছেন, আকাশেও দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের দেহ মুবারাক কবরেও শায়িত রহিয়াছে।

আর এইখানে উহার বিপরীত হইয়াছে। মোট কথা, মি'রাজ যদি উনসুরী দেহে না হইত, তাহা হইলে এত বিরোধিতাও হইত না। আর যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হুজুর (সঃ) সোজাসুজি বলিয়া দিতেন, আমি কি উনসুরী দেহে অর্থাৎ সশরীরে যাওয়ার দাবী করিয়াছি? যাহাকে তোমরা অসম্ভব মনে করিতেছ?

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৪। মি'রাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত হুজুরের সশরীরে গমন সম্বন্ধে অবিশ্বাসকারী কাফির এবং বিরূপ ব্যাখ্যাকারী বেদআতী ও ফাসেক হইবে। কেননা এই পর্যন্ত যাওয়া সম্বন্ধে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আর সম্মুখে আসমানের দিকে গমন সম্বন্ধে অবিশ্বাসকারী বা বিরূপ ব্যাখ্যাকারী উভয়ে বেদআতী। যদিও সূরা 'আন্নাজমের' আয়াতে প্রায় প্রকাশ্যেই হুজুরের আসমানে আরোহণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তথাপি উক্ত আয়াতে এইরূপ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হুজুর (সঃ) দ্বিতীয় বার জিবরাঈলকে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার নিকট দাঁড়ান অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহাতে হুজুরের সেই পর্যন্ত যাওয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় না। অতএব তাঁহার আসমানে আরোহণের কথা অবিশ্বাস করিলে কাফির বলা যাইবে না।

৫। মি'রাজ রাত্রিতে হুজুর (সঃ) আল্লাহ্ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না? একথার মধ্যে মতভেদ আছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামগণ এ বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন, প্রত্যেক পক্ষেরই

পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকার টীকা ঃ

এইখানে ঐ সম্ভাবনাও দূরীভূত হইয়া গেল যে, উনসুরী দেহ এই স্থানে ছিল আর মেছালী দেহে মি'রাজ হইয়াছিল। কেননা যদি এমন হইত, তাহা হইলে সেই ধরনের উত্তর দিয়া তিনি সমাধান দিতেন।

তাহা ছাড়া মেছালী দেহের বোরাকে আরোহণ করার প্রয়োজন হইত না এবং পর্দা অতিক্রম করার পর হুজুর (সঃ) একাকী হওয়ার কারণে যেভাবে ভয় অনুভব করিয়াছিলেন– "যাহা পরে আবু বকরের আওয়াজের মত আওয়াজ পাইয়া দূরীভূত হইয়া গিয়াছে", তাহা কখনও হইত না। কেননা এই ধরনের ভয়–ভীতি উনসুরী দেহেরই হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রত্যাবর্তনকালে দাজনানে পিপাসায় পানি পান করা ইহাও তাহার প্রমাণ। কেননা মেছালী দেহ পিপাসা হইতে মুক্ত।

(ইহার পরেও আরো কিছু হাকীকাত রহিয়াছে যাহা মোহাক্কিক আলিম ছাড়া সর্বসাধারণের বুঝিবার নয়; এইজন্য লেখা হইল না।) [টীকার টীকা শেষ]

প্রমাণের জন্য যে সকল রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা অন্য অর্থ হওয়ারও অবকাশ রাখে। কেননা আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার পক্ষে যেসব রিওয়ায়াত রহিয়াছে তাহাতে এইরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলাকে অন্তর চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াছেন। আর না দেখার পক্ষে যেসব রিওয়ায়াত রহিয়াছে তাহাতে এইরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় দেখেন নাই। যেমন– পরলোকে বেহেশ্তের মধ্যে যেরূপ মুমিনগণকে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট দর্শন দান করিবেন, মি'রাজ রাত্রের দর্শন তত স্পষ্ট হয় নাই। যদিও উহাকে স্বচক্ষে দর্শনই বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দৃষ্টিশক্তি যাহাদের দুর্বল, তাহারা চশমা ভিন্নও দেখিতে পায়, কিন্তু চশমা পরিলে আরও স্পষ্টরূপে দেখে। তদ্রূপ মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলাকে হয়ত অস্পষ্টরূপে দেখিয়া থাকিবেন। মোট কথা, এ বিষয়ে কোন পক্ষে দৃঢ় মত পোষণ না করিয়া নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম। {আর এইরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এই সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন।}

প্রশ্নের মীমাংসা ঃ কাহারো সন্দেহ জাগিতে পারে যে,

১। অন্য আয়াতে রহিয়াছে–

نُرِىٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

(অর্থাৎ আমি ইবরাহীমকে (আঃ) আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত নিদর্শন সমূহ দেখাইয়াছি।) অথচ হুজুর (সঃ)-এর জন্য مِــنْ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে– যাহার অর্থ কিছু নিদর্শন দেখান হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে মনে হইতে পারে যে ইহাতে হুজুরের (সঃ) মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার উত্তর এই যে– আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত নিদর্শনসমূহ তো সমস্ত নিদর্শন নহে। সুতরাং বুঝা যায়, ইবরাহীম (আঃ)–কেও কতক নিদর্শন দেখান হইয়াছিল। অতএব যে কতক নিদর্শন হুজুর (সঃ)–কে দেখান হইয়াছিল, তাহা ইবরাহীম (আঃ)–কে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠতমও হইতে পারে।

২। কতিপয় বস্তুবাদী লোক এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে যে, আসমানের ফাঁক হওয়া এবং যুক্ত হওয়া অসম্ভব, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসমান ভেদ করিয়া কি করিয়া উপরে উঠিলেন? ইহার উত্তর এই যে, আসমান বিদীর্ণ ও সংযুক্ত হওয়ার পক্ষে যেসব প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে, সেগুলি ঠিক নহে, যথাস্থানে তাহার বিবরণ দেখিয়া লইবেন।

৩। কেহ কেহ সন্দেহ করে যে, এত দূরবর্তী পথ হুজুর (সঃ) এত দ্রুত গতিতে কিরূপে ভ্রমণ করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, কয়েকটি গ্রহ-নক্ষত্র বিরাটাকার হওয়া সত্ত্বেও অতিশয় দ্রুতগামী, কিন্তু হুজুরের দেহ তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আর দ্রুত গতির কোন সীমা ও পরিমাণ অনুমান করা সম্ভবপর নহে। অতএব যত দ্রুত ভ্রমণ করার প্রয়োজন ছিল তত দ্রুত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

৪। কেহ কেহ বলে, আসমানের অদূরে নিম্নে বায়ুর স্তর নাই, তথাকার উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, রক্ত-মাংসের শরীরে তথায় নিরাপদ থাকা অসম্ভব। তাহা হইলে হুজুর কিরূপে অতিক্রম করিলেন? উত্তর এই যে, অসম্ভব কোন দিনও সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু দুরূহ ও দুঃসাধ্য সম্ভব হইতে পারে। উপরোক্ত তাপমণ্ডল ভেদ করা অসম্ভবের মধ্যে গণ্য নহে, উহা দুরূহ।

৫। কেহ কেহ বলে, আসমানের অস্তিত্বই নাই, তবে তিনি আরোহণ করিলেন কিসে? উত্তর এই যে, আসমানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া আমরা স্বীকার করি না, কাহারো নিকট না থাকার পক্ষে প্রমাণ থাকিলে বর্ণনা করুক।

'তানভীরুস্ সিরাজ ফী লাইলাতিল মি'রাজ'

সমাপ্ত

আসমান ভ্রমণে সন্দেহের অবসান

আল–কুরআনের "সুবহানাল্লাযী আসরা ...." আয়াতের মধ্যে ভ্রমণের শেষ সীমা হিসাবে আসমানের উল্লেখ না হইয়া মাসজিদে আকসার উল্লেখ হওয়ার কারণে কোন কোন লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে, হুজুর (সঃ) আসমানে যান নাই।

উক্ত সন্দেহের উত্তর ঃ {ক} ঐ সকল হাদীসের দ্বারা হইয়া যায়, যেইগুলিতে আসমান ভ্রমণের স্পষ্ট বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। {খ} কুরআন মাজীদের 'আন্নাজম' সূরার ولقد راه نزلة اخرى আয়াতে আসমান ভ্রমণের ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহার পরেও আসমান ভ্রমণ সম্বন্ধে সন্দেহ করা অমূলক ও বাতিল ছাড়া আর কিছুই নহে। {গ} যেকোন বিষয়বস্তু বর্ণিত হওয়ার স্থানে উক্ত বিষয়ের সকল শাখা-প্রশাখা এবং খুঁটিনাটি এক সঙ্গে সেই একই স্থানে বর্ণিত হওয়া জরুরী নহে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াতে আসমানের উল্লেখ না করার মধ্যে বিশেষ হিকমাত নিহিত রহিয়াছে। আর তাহা ছাড়া উল্লেখ হওয়া ছহীহও ছিল না। ইহার ব্যাখ্যা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

নং ১– এই আয়াতের প্রারম্ভে "اسرى بعبده ليلا", রহিয়াছে। যাহার মধ্যে এই হিকমাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই কার্য রাত্রি বেলায় সংঘটিত হইয়াছে। (আর রাত্র শব্দ উল্লেখ দ্বারা অত্যধিক খাস নির্জনতা ও বন্ধুত্বের পরিচয় বুঝান হইয়াছে। কেননা সাধারণতঃ রাত্রের বেলায়ই সর্বোত্তম নির্জনতা লাভ করা যায়)। এই খাস করায় {অর্থাৎ রাত্রের জন্য নির্জনতা নির্দিষ্ট করার দ্বারা} প্রকৃত ঘটনার সহিত উত্তম মিল হইয়াছে।

নং ২– দ্বিতীয় বিষয় এই হইতেছে যে, রাত ও দিবসের সীমা মাত্র বাষ্প মিশ্রিত ঘন বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত। অর্থাৎ ইহাই হইতেছে রাত্র ও দিবস অঞ্চল। আর এইখানেই বায়ু চলাচল হয় এবং ইহারই রহিয়াছে অন্ধকার ও আলো ধারণ করার ক্ষমতা। এই মণ্ডল মাত্র ৫১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার উপরের বায়ুর সহিত বাষ্প মিশ্রিত না হওয়ার কারণে তথাকার বায়ু খুবই স্বচ্ছ, হালকা ও পাতলা। সেই স্থানে সূর্য রশ্মির প্রতিফলন ঘটে না। আরো উপরে এমনও অঞ্চল রহিয়াছে যেই স্থানে বায়ু বলিতে কিছুই নাই। তাই উক্ত স্থানসমূহে দিবসের অস্তিত্ব নাই। আর রাত্র হইতেছে দিবসের বিপরীত। অতএব দিবস যখন নাই, তবে রাত্রও নাই। এই ব্যাখ্যাদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল, আসমানের উপর তো দূরের কথা, পৃথিবী হইতে মাত্র ৫০ মাইল উপরেও রাত্র দিবসের কোন অস্তিত্ব নাই। অতএব মাসজিদে আকসা উল্লেখ করার পর যদি আসমানে উঠার উল্লেখ হইত, তাহা হইলে উহাও রাত্রের মধ্যেই হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িত। অথচ আসমান এবং তাহার উপরে রাত্রের কোন অস্তিত্বই নাই। সেই জন্য আসমানের উল্লেখ করা হয় নাই।

আমি এই ব্যাখ্যাটুকু কুতবুল আলাম হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভীর (রাহঃ) সর্বশেষ রচিত মহাগ্রন্থ "বাওয়াদিরুন নাওয়াদির" কিতাব হইতে সংক্ষেপে এইখানে লিখিয়াছি।

–বাওয়াদিরুন্ নাওয়াদির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫, ৩৬; দিল্লীর কামাল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত, ১৩৬৫ হিজরী। –অধম অনুবাদক আবদুল্লাহ

☆☆☆